লোক প্রশাসন সাময়িকী
নবম সংখ্যা
জুন ৯৭, আষাঢ় ১৪০৪

লোকপ্রশাসন সাময়িকী

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা

লোকপ্রশাসন সাময়িকী

নবম সংখ্যা, জুন ১৯৯৭, আষাঢ় ১৪০৪

সম্পাদনা পরিষদ

এ. কে. এম. নাসিরুল হক
মোঃ সিরাজুল ইসলাম
কঙ্কা জামিল

সম্পাদক
আ. ক. ম. মাহবুবুজ্জামান

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
নবম সংখ্যা, জুন ১৯৯৭, আষাঢ় ১৪০৪

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের
ত্রৈমাসিক মুখপত্র

সম্পাদক ঃ আ. ক. ম. মাহবুবুজ্জামান

© ১৪০৩
বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র,
সাভার, ঢাকা

টেলিফোন	ঃ	৮৩১৭১৫-২০ (পিএবিএক্স)
টেলেক্স	ঃ	৬৩২২২৮ পিএটিসি বিজে
ফ্যাক্স	ঃ	৯৩৩২০১৬
বিপিএটিসি	ঃ	প্রকা–৩০/বাজা–৬/৯৬
বিপিএটিসি গ্রন্থাগার	ঃ	৩৫১.০০০৫
প্রচ্ছদ	ঃ	কাজী আজাদ
মূল্য	ঃ	পনের টাকা
মুদ্রণে	ঃ	ইছামতি অফসেট প্রেস ১/১ হাজীপাড়া, রামপুরা ঢাকা-১২১৯। ফোন ঃ ৪১৩৭৩৭

LOKPROSHASHON SAMOEEKY
Vol.9, June 1998, Ashar 1404

Quarterly Bengali Journal of
Bangladesh Public Administration Training Centre

Editor : A. K. M. Mahbubuzzaman

© 1403
Bangladesh Public Administration Training Centre
Savar, Dhaka.

Telephone	:	831715-20 (PABX)
Telex	:	632228 PATC BJ
Fax	:	9332016
BPATC	:	Pub-30/BJ-7/96
BPATC Library	:	351.0005
Cover Design	:	Qazi Azad
Price	:	Taka Fifteen only

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
নবম সংখ্যা
জুন ১৯৯৭, আষাঢ় ১৪০৪

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা
১.	মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে আমলাতন্ত্রের ভূমিকা ঃ বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত **নীলুফার বেগম** **আবদুল্লাহ এম. খান**	১
২.	উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকৃতি, গতিধারা ও বিবর্তন **ডঃ মীর ওবায়দুর রহমান**	১৭
৩.	বাংলাদেশের জাতিসত্ত্বার সন্ধান **মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা**	২৯
৪.	মধ্যযুগে বাংলাদেশের আর্থ-প্রশাসনিক অবস্থা **আ, ক, ম, মাহবুবুজ্জামান**	৩৭
৫.	যুগপরিক্রমায় জেলা পরিষদ ঃ বর্তমান কাঠামো ও ভবিষ্যত সম্ভাবনা **মুহাম্মদ আব্দুল কাদের**	৫১
৬.	লোক-প্রশাসন দক্ষতা ঃ একটি পর্যবেক্ষণমূলক আলোচনা **এ, কে, এম, মতিউর রহমান** **মোঃ জাহিদুর রহমান**	৬৭
৭.	স্বাধীনতা ও দেশপ্রেম **এ, এস, এম, আবদুল হালিম**	৭৭
৮.	[illegible] বাজেট (রাজস্ব ও উন্নয়ন) ঃ প্রস্তুতকরণ, বিশ্লেষণ ও পরিবীক্ষণ **মোঃ হাসিবুর রহমান**	৮৩
৯.	বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের চাহিদা ও কার্যকারিতা বিশ্লেষণ ঃ লোক প্রশাসন প্রসঙ্গ **মোঃ সিরাজুল ইসলাম**	৯৭

লোক প্রশাসন সাময়িকী
৯ম সংখ্যা, জুন ৯৭, আষাঢ় ১৪০৪

মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে আমলাতন্ত্রের ভূমিকাঃ বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত

নীলুফার বেগম *
আবদুল্লাহ এম. খান **

সংজ্ঞায়ন ও প্রসঙ্গ কথা ঃ মুক্ত বাজার অর্থনীতি

সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ বিশ্বের অনেক সমাজতান্ত্রিক দেশের আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিপর্যয়ের পরে এই প্রসঙ্গটির দার্শনিক গুরুত্ব অতীতের চেয়ে অনেক বেড়েছে বিধায় মুক্ত বাজার অর্থনীতি বা 'বাজার অর্থনীতি' শব্দটি চারদিকে এখন হামেশাই আলোচিত হচ্ছে। "Macmillan Dictionary of Economics" এর প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী 'বাজার অর্থনীতি' তথা মুক্ত বাজার অর্থনীতি হচ্ছে ঃ

"An economic system in which decisions about the allocation of resources and production are made on the basis of prices generated by volunatary exchanges between producers, consumers, workers and owners of factors of production. Decision making in such an economy is decentralized i.e. decisions are made independently by groups and inviduals in the economy, rather than by Central planners."[১]

অর্থাৎ "এটা হচ্ছে এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে সম্পদের বন্টন এবং উৎপাদন সম্পর্কিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় মূল্য বা দামের ভিত্তিতে, যা কিনা পক্ষান্তরে নির্ধারিত হয় ভোক্তা, শ্রমিক এবং উৎপাদনের উপকরণসমূহের স্বত্ত্বাধিকারীদের স্বতঃস্ফুর্ত মিথস্ক্রিয়ার ফলে। এই ধরনের ব্যবস্থায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ

১ "Macmillan Dictionary of Modern Economics" edited by David W. pearce. The Macmillan press Ltd. 1985. p. 273 (Market Economy).

* এম. ডি. এস., বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা।

* * সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা।

প্রক্রিয়া বিকেন্দ্রীভূত হয়ে থাকে অর্থাৎ সিদ্ধান্তসমূহ প্রণীত হয় কেন্দ্রীয় পরিকল্পনাকারীদের পরিবর্তে অর্থনীতিতে স্বাধীনভাবে কর্মরত গোষ্ঠীসমূহ এবং ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক।"

"McGraw-Hill Dictionary of Modern Economics" এর মতে বাজার অর্থনীতি হলো" Mode of economic organization in which the forces of supply and demand are relied upon to solve the problems of the selection of which goods to produce the method of producing them and the presons who will receive them once they have been produced."[২]

অর্থাৎ "এটি হলো অর্থনৈতিক সংগঠনের এমন এক অবস্থা যেখানে সংশ্লিষ্ট অর্থনীতিতে কি কি দ্রব্য ও সেবা কি কি পদ্ধতিতে কার কার ভোগের জন্য উৎপাদিত হবে সে সব প্রশ্নের মীমাংসার ভার বাজারের সুরবরাহ ও চাহিদা শক্তির উপর ছেড়ে দেওয়া হয়।

উপর্যুক্ত সংজ্ঞা দুটো থেকে একথা সহজেই অনুধাবন করা যেতে পারে যে, মুক্ত বাজার অর্থনীতি হলো কেন্দ্রীয়ভাবে পরিকল্পিত অর্থনীতির বিপরীত একটি প্রত্যয় যা অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বাজার শক্তি তথা চাহিদা ও সরবরাহের নেতৃত্বকে প্রচার করে থাকে। উল্লেখ্য, মুক্তবাজার অর্থনীতিকে পুঁজিবাদী অর্থনীতি এবং কেন্দ্রীয়ভাবে পরিকল্পিত অর্থনীতিকে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি নামেও প্রায়শ অভিহিত করা হয়।

আমলাতন্ত্র; সংজ্ঞা ও উৎপত্তিগত কারণ অনুসন্ধান

আর আমলাতন্ত্র বা Bureaucracy সম্বন্ধে 'Oxford Reference Dictionary' এর ভাষ্য হলোঃ "Government by the officials of a central administration rather than by elected representative"[৩] অর্থাৎ, আমলাতন্ত্র হলো কেন্দ্রীয় প্রশাসনের দ্বারা পরিচালিত এমন একটি সরকার, যেখানে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নয় বরং সরকারী স্থায়ী কর্মচারীদের প্রাধান্য থাকে। Chambers Dictionary প্রদত্ত সংজ্ঞানুযায়ী আমলাতন্ত্র হ'লোঃ "Any system of administrtion in which matters are hindered by excessive adherence to minor rules and procedures..."[৪] অর্থাৎ এটি হলো এমন একটি প্রশাসনিক ব্যবস্থা যেখানে তুচ্ছ নিয়মকানুন এবং পদ্ধতির প্রতি অত্যধিক

---

২ The concise McGraw-Hill Dicitionary of Modern Economics. by Douglas Greenwald. McGraw-Hill. Inc. 1984. P. 216 (Market-Directed Economy).

৩ The Oxford reference Dictionary. edited by Joyce M. Hawkins. Oxford University Press. 1986 p. 716.

৪ The Chambers Dictionary. edited by Catherine Schwarz. Chambers Harrap Publishers Ltd. 1996 (Reprinted in India) p. 223.

গুরুত্ব আরোপিত হবার কারণে কর্মসম্পাদন ব্যাহত হয়।" আমলাতন্ত্রের পক্ষে-বিপক্ষে বিস্তর সমালোচনা চালু থাকার ফলে অনেক ক্ষেত্রে এই প্রত্যয়টির প্রকৃত অর্থের সাথে প্রয়োগিক অর্থের বিস্তর ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়।

Encyclopaedia Britainicaতে বলা হয়েছে, আমলাতন্ত্র হলো ঃ "a professional corps of officials organized in a pyramidal hierarchy and functioning under impersional, uniform rules and procedures"[৫] অর্থাৎ এটা হলো একদল পেশাদার কর্মচারীর একটি সংস্থা যার স্তর বিন্যাস পিরামিড আকৃতির এবং যা নৈর্ব্যক্তিকভাবে এবং সমজাতীয় বিধি বিধান দ্বারা পরিচালিত হয়।" আমলাতন্ত্রের নৈর্ব্যক্তিক সংজ্ঞা অনেক রয়েছে। যেমন Blau এবং Mayer বলেন ঃ "বৃহদায়তন সংগঠনের বিভিন্ন একক ব্যক্তির ওপরে অর্পিত প্রশাসনিক দায়িত্বসমূহকে একটি সুবিন্যস্ত, সমন্বিত পন্থায় সম্পাদনের জন্য সৃষ্ট সাংগঠনিক রীতিই হলো আমলাতন্ত্র।"৬ আমলাতন্ত্র সম্পর্কিত আধুনিক ধারণার প্রথম এবং প্রধানতম প্রবক্তা অবশ্যই ম্যাক্স ওয়েবার। এই বিদগ্ধ জার্মান চিন্তাবিদ আমলাতন্ত্র সম্পর্কে তাঁর 'Essays in Sociology' এবং 'Theory of Social and Economic Organization, শীর্ষক গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

একটি পদ্ধতি হিসেবে আমলাতন্ত্রের প্রায়োগিক গুরুত্বের উপলব্ধি থেকে ম্যাক্স ওয়েবার এর বৈশিষ্ট্য নিরূপণ ও পদমর্যাদা নির্ধারক নীতিমালা নির্ধারণ করেই শুধু ক্ষান্ত হননি। একজন গভীর অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন সমাজবিজ্ঞানী হিসেবে তিনি আমলাতন্ত্রের উৎপত্তির সামাজিক ও অর্থনৈতিক কার্যকারণ সম্পর্কেও সম্যক সচেতন ছিলেন। তাঁর মতে আমলাতন্ত্রের আধুনিক কাঠামোর উৎপত্তির সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণসমূহ হচ্ছে ঃ

১. মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতির বিকাশ

প্রাচীনকালে অমুদ্রায়িত তথা দ্রব্য বিনিময়ভিত্তিক অর্থনীতিতে আমলাতন্ত্রের উপস্থিতি বিদ্যমান থাকলেও প্রকৃত প্রস্তাবে মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতির বিকাশের সাথে সাথেই আমলাতন্ত্রের পরিধি প্রসারিত হয়েছে।

২. প্রশাসনিক কাজকর্মের পরিসর বৃদ্ধি

রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠানের আয়তন ও আকৃতি তথা প্রশাসনিক কাজকর্মের পরিসর বৃদ্ধির সাথে সাথে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আমলাতন্ত্রের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। এই বৃদ্ধির বিষয়টি রাষ্ট্রের সামগ্রিক কর্মকান্ডের গুণগত ও পরিমাণগত এই উভয়বিধ পরিসীমা বৃদ্ধির সাথে সম্পর্কিত।

৩. সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত বিকাশের প্রভাব

সারা বিশ্বের অব্যাহত সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত বিকাশের সাথে সাথে আমলাতন্ত্রের কর্মক্ষেত্রও ক্রমেই প্রসারিত হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্রের পাশাপাশি এখন আন্তর্জাতিক আমলাতন্ত্রেরও উদ্ভব হয়েছে।

---

৫ Encyclopaedia Britanica. Vol 2. 1985. P. 642

৬ Blau and Mayer. P. 23

৪. আমলাতান্ত্রিক গঠনতন্ত্রের কারিগরী সুবিধা

ম্যাক্স ওয়েবারের মতে, আমলাতান্ত্রিক সংগঠন অন্য যে কোন সংগঠনের তুলনায় শ্রেয়তর। তিনি বলেন, "প্রকৃত পক্ষে কাজের গতি, অনিশ্চয়তা পরিহার, দলিল পত্রাদি সংরক্ষণ সংক্রান্ত জ্ঞান, ধারাবাহিকতা রক্ষা, বিচক্ষণতা, কাজের মধ্যকার সংগতিরক্ষা, অধঃস্তনিক শৃংখলারক্ষা এবং দ্বন্দ্ব পরিহার করা প্রভৃতি দিকের বিবেচনায় আমলাতন্ত্র হচ্ছে প্রশাসন ব্যবস্থার একটি সম্মানজনক ও পেশাবৃত্তিক পদ্ধতি।"[৭]

এই উদ্ধৃতিতে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যসমূহ কেবল যে সরকারী প্রশাসনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এমন নয়। এগুলো বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। প্রকৃতপক্ষে, আমলাতন্ত্র হচ্ছে অত্যন্ত নিয়ম ও প্রথানিষ্ঠ, সুনির্দিষ্ট স্তরভিত্তিক এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে উদ্ভূত পরিস্থিতি পর্যালোচনায় অপেক্ষাকৃত অনাগ্রহী অথচ বিধিবদ্ধ নিয়ম-কানুন অনমনীয়ভাবে প্রয়োগে অভ্যস্ত একটি কর্মী সংগঠন।

ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, রাজশক্তি বা শাসকশক্তি স্বীয় শাসনকে নিরঙ্কুশ এবং দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য একদল স্থায়ী রাজকর্মচারী নিয়োগের মাধ্যমে আমলাতন্ত্রের গোড়াপত্তন করেছিলেন। তাই আমলাতন্ত্র বলতে সচরাচর সরকারী স্থায়ী কর্মচারী দ্বারা পরিচালিত প্রশাসন যন্ত্রকেই বোঝানো হয়ে থাকে। এই নিবন্ধেও বাংলাদেশের আমলাতন্ত্র বলতে দেশের সরকারী কর্মচারী নিয়ন্ত্রিত প্রশাসন যন্ত্রকেই বোঝানো হয়েছে।

মুক্ত বাজার, সমাজতান্ত্রিক ও মিশ্র অর্থনীতি

মুক্ত বাজার অর্থনীতি হলো ধ্রুপদী অর্থে পুঁজিবাদী অর্থনীতি। এ্যাডাম স্মীথ, ডেভিড রিকার্ডো থেকে শুরু করে এমনকি কেইনসীয় ঘরাণার (Keynesian school of thought) ব্যক্তিবৃন্দ পর্যন্ত অধিকাংশ অর্থনীতিবিদের আরাধ্য অর্থনীতি। এই অর্থনৈতিক দর্শনের মূল কথা হলো 'Laissez-Faire' অবাধ স্বাধীনতা। এই দর্শনের অপর অভিব্যক্তি হলো 'Survival of the fittest'যোগ্যতমের শ্রেষ্টত্ব। এই ধ্রুপদী বাজারবাদী অর্থনীতিবিদগণ বলতে চান-"শত ফুল ফুটতে দাও, যেটা যদ্দিন টিকে থাকার–থাকবে; সময় এলে ঝরে যাবে।" বাজার অর্থনীতি উৎপাদনের উপকরণসমূহের ব্যক্তিগত মালিকানা ব্যতীত টিকে থাকতে পারে না। তাই এই অর্থনৈতিক দর্শনের বিপরীত দর্শন হলো ধ্রুপদী সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি, যেখানে উৎপাদনের উপকরণসমূহের ওপরে ব্যক্তিগত মালিকানা বিলুপ্ত করে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠার কথা ব্যক্ত হয়েছে। অপর এক ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হলো মিশ্র অর্থনীতি। এই অর্থনীতিতে উৎপাদনের উপকরণসমূহের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা বজায় থাকে। সত্যিকথা বলতে কি, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পূর্ব ইউরোপের একদা 'সমাজতান্ত্রিক' নামে পরিচিত দেশসমূহের সাম্প্রতিক আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের পরে একথা এখন জোর দিয়েই বলা

---

৭ A. H. Handerson and Talcot Parsons. (Translated). Max Weber: The Theory of Social and Economic Organization London. 1964. P. 204-216.

যায় যে, আজকের পৃথিবীতে কোন দেশেই নিরঙ্কুশভাবে বাজার অর্থনীতি কিংবা 'সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি' প্রচলিত নেই। আজকের বিশ্বের সব দেশই 'মিশ্র অর্থনীতি'র দেশ, যেখানে উৎপাদনের উপকরণের ওপরে ব্যক্তিগত এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানা উভয়ই পাশাপাশি বিরাজমান। তাহলে প্রশ্ন ওঠে, যদি বাজার অর্থনীতি নামে কোন কিছুর অস্তিত্ব না-ই থাকে, তবে এ নিবন্ধ রচনার যৌক্তিকতা কোথায়? এর উত্তরে বলা যায়, ধ্রুপদী বা নিরঙ্কুশ অর্থে কোন বাজার অর্থনীতি বর্তমানে প্রচলিত না থাকলেও, আপেক্ষিক অর্থে অবশ্যই বাজার অর্থনীতি সক্রিয় রয়েছে। যে দেশের অর্থনীতিতে যতো বেশী বাজার শক্তির প্রাধান্য তথা ব্যক্তিমালিকানাধীন খাতের প্রাধান্য থাকবে, সেই দেশকে ততো বাজারমুখী অর্থনীতির দেশ বলা যাবে। আর যে দেশের অর্থনীতিতে ব্যক্তিমালিকাধীন খাতের চেয়ে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন খাতের প্রাধান্য থাকে, সেই দেশকে ততোটা মিশ্র অর্থনীতিমুখী দেশ বলে গণ্য করা যায়।

মুলত পঞ্চাশের দশকের শেষভাগ থেকে তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহ রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করতে শুরু করে। এই নব্য স্বাধীন উন্নয়নশীল দেশগুলোর অধিকাংশই দারিদ্র্যপীড়িত এবং জনঅধ্যুষিত। ঔপনিবেশিকসূত্রে এই দেশসমূহ যে অর্থনৈতিক কাঠামো অর্জন করেছিলো তা ছিলো কৃষি নির্ভর, শিল্পখাত ছিলো অবিকশিত এবং বৈদেশিক বাণিজ্যে ছিলো ভোগ্যপণ্য আমদানী নির্ভরতা এবং কাচামাল রপ্তানীর প্রাধান্য আর সর্বোপরি লেনদেন ভারসাম্যে ছিলো চরম প্রতিকূলতা।

তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহ তাদের সদ্য পাওয়া স্বাধীনতাকে কাজে লাগিয়ে এই পাহাড় পরিমাণ দারিদ্র্যকে কিভাবে দ্রুত অপসারিত করতে পারে এ নিয়ে যখন ভাবছিলো, তখন তাদের সামনে এলো সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চীনসহ কতিপয় সামাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উচ্চ প্রবৃদ্ধি হারের দৃষ্টান্ত। সেই সাথে এলো উক্ত দেশসমূহ অনুসৃত অর্থনৈতিক নীতিমালা তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহে প্রবর্তনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রণোদনা। ফলে তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশ ষাট থেকে আশির দশকের মধ্যভাগ পর্যন্ত স্ব স্ব অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয় খাতের নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি এবং ব্যাংকিং ও শিল্পখাতে জাতীয়করণ নীতির ঢালাও বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখলো এবং ফলে পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির পাশাপাশি 'মিশ্র অর্থনীতি' প্রত্যয়টি স্বল্প সময়ের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠলো। কেননা, সে সময়ে তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড আক্ষরিক অর্থেই ছিলো কিছুটা ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণে এবং কিছুটা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে।

মুক্তবাজার অর্থনীতির কতিপয় বৈশিষ্ট্য এবং বাংলাদেশের বাস্তবতা

অর্থনীতিবিদগণের মতে মুক্তবাজার অর্থনীতির অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১। বাজারে বিপুল সংখ্যক ক্রেতা ও বিক্রেতার উপস্থিতি

২। পণ্যের বিজ্ঞানসম্মত প্রমিতকরণ (Standardization) এবং পর্যায়িতকরণ (Grading)

৩। উদ্যোক্তার পর্যাপ্ত স্বাধীনতা এবং নিরাপত্তা

৪। বাজার সংক্রান্ত তথ্যের অবাধ প্রবাহ

৫। উৎপাদনের উপাদানের পূর্ণ গতিশীলতা

৬। আর্থ-সামাজিক অবকাঠামোগত উন্নয়ন

৭। ব্যক্তিখাতের বিকাশে আগ্রহী, দক্ষ এবং দুর্নীতিমুক্ত রাজনৈতিক নেতৃত্ব ইত্যাদি।

এই বৈশিষ্ট্যসমূহ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বাস্তবে কতখানি বিদ্যমান, সে বিষয়ে উপরোক্ত ধারাক্রমে কিঞ্চিত আলোকপাতের চেষ্টা করা যেতে পারে।

১. বাংলাদেশ জনসংখ্যার বিচারে বিশাল একটি দেশ হ'লেও, ক্রেতার ক্রয় ক্ষমতার বিচারে এর বাজারের আয়তন খুবই সীমিত। অর্থশাস্ত্রের সংজ্ঞা অনুযায়ী, ভোক্তা বা ক্রেতা তাকেই বলা হয়, যার কোন একটি পণ্যের জন্য অভাববোধ যেমন র'য়েছে, তেমনি রয়েছে নির্দিষ্ট মূল্যে পণ্যটি কেনার সামর্থ্য। অর্থাৎ, কোন পণ্য কেনার ইচ্ছার সাথে নির্দিষ্ট দামের বিনিময়ে পণ্যটি কেনার সামর্থ্যের সমন্বয় ঘটলে তবেই অর্থনীতিতে কার্যকর চাহিদার (Ettective Demand) উদ্ভব হয়। যে দেশে মোট কার্যকর চাহিদার পরিমাণ যতো বেশী, সে দেশে বাজারের আয়তনও ততো বড় হবে–এটাই বাজারবাদী অর্থনীতিবিদগণের অভিমত।

আমাদের দেশে মোট জনসংখ্যা বিপুল হ'লেও জনগণের মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ খুবই কম বিধায় বাজারে সক্রিয় ক্রেতার উপস্থিতি আশানুরূপ নয়। অবশ্য, জাতীয় আয়ের বন্টনগত পুনর্বিন্যাস সাধনের মাধ্যমে এই পরিস্থিতির স্বল্পমেয়াদী উত্তরণ সম্ভব। দীর্ঘমেয়াদী সমাধানের জন্য মোট জাতীয় আয়ের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই। উভয় ক্ষেত্রেই আমলাতন্ত্রের অধিকতর অংশগ্রহণের অবকাশ রয়েছে।

২. মুক্তবাজার অর্থনীতিতে পণ্য ও সেবার বিজ্ঞানসম্মত প্রমিতকরণ ও পর্যায়িতকরণের নিশ্চয়তা বিদ্যমান থাকে। এটা সম্ভব হয় উদ্যোক্তা এবং উৎপাদকগণের অব্যাহত আন্তঃ প্রতিযোগিতা এবং ভোক্তা ও ক্রেতাদের অধিকার, স্বাস্থ্য এবং পরিবেশ সচেতনতার কারণে। বাংলাদেশে পণ্যের প্রমিতকরণ এবং পর্যায়িতকরণ এখন অবধি তেমন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পরিগ্রহ করেনি। বাজারে এমন অনেক পণ্য বাজারজাত করা হয়, যেগুলো মান সম্মতভাবে উৎপাদিত হয়নি বিধায় জনস্বাস্থ্য এবং পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর।

'বাংলাদেশ ষ্ট্যান্ডার্ডস্ এ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন, (বি. এস. টি. আই.) নামের একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান রয়েছে দেশে। এই প্রতিষ্ঠানের কাজ হ'লো যে কোন পণ্য দেশে বাজারজাতকরার আগে, যে গুলো বিজ্ঞান সম্মতভাবে উৎপাদিত, প্রমিতকৃত (Standardized) এবং পর্যায়িতকৃত (Graded) হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে পরীক্ষান্তে ছাড়পত্র প্রদান করা। কিন্তু দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, বাংলাদেশের বাজারে বি. এস. টি. আই. কর্তৃক অনুমোদিত নয়-এমন অনেক পণ্যও অকাতরে কেনা-বেচা হচ্ছে। এ অবস্থার আশু উন্নয়ন বাজার অর্থনীতির বিকাশের অন্যতম পূর্বশর্ত।

৩. মুক্তবাজার অথর্নীতিতে উদ্যোক্তাবৃন্দের পর্যাপ্ত স্বাধীনতা থাকতেই হবে। তারা তাদের সৃজনশীলতা প্রয়োগ করে নতুন নতুন পণ্য ও সেবা উৎপাদন করবেন, তবেই না অর্থনৈতিক বিকাশে গতি সঞ্চারিত হবে! বাংলাদেশে শিল্পস্থাপনে উদ্যোক্তাগণ অনেক বাধার সম্মুখীন হ'য়ে থাকেন। কারখানা বা উৎপাদন প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুত, টেলিফোন, পানি, গ্যাস, ব্যাংকিং, বীমা প্রভৃতি ইউটিলিটি সার্ভিস পেতে তাদেরকে গলদঘর্ম হ'তে হয়। তাছাড়া চাঁদাবাজ এবং সন্ত্রাসীদের দৌরাত্ম্যে সর্বদা তাঁদেরকে শঙ্কিত থাকতে হয়।

মুক্তবাজার অর্থনীতির বিকাশের স্বার্থে উদ্যাক্তাদের পর্যাপ্ত স্বাধীনতা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করা উচিত। সরকারের সংশ্লিষ্ট এজেন্সীসমূহকে এ বিষয়ে অধিক তৎপর হতে হবে।

৪. বাজার অর্থনীতিতে তথ্যের অবাধ প্রবাহ বিদ্যমান থাকতে হয়। কোথায় কোন দামে কোন পণ্য ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে, সেই সংক্রান্ত তথ্য সকল অঞ্চলের সকল ক্রেতা এবং বিক্রেতার জানা থাকতে হয়। বিজ্ঞানের উন্নতির ফরে ইলেক্ট্রনিক এবং স্যাটেলাইট মিডিয়ার প্রসার ঘটায় পশ্চিমা বিশ্বের উৎপাদক এবং ভোক্তাগণ প্রতিমূহুর্তে বিশ্ববাজারের সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত সম্পর্কে অতি সহজেই অবগত হ'তে পারছেন এবং সেই অনুযায়ী পরবর্তী কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে পারছেন। কিন্তু বাংলাদেশে এখনও বাজার সংক্রান্ত তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। তাই দেখা যায় যে, বাংলাদেশের বাজারে একই পণ্য বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন দামে বিক্রী হচ্ছে এমনকি, একই বাজারে বিভিন্ন ক্রেতার কাছে একই পণ্য বিভিন্নদামে বিক্রী করা হচ্ছে। যদি বাজার সংক্রান্ত অবাধ তথ্য প্রবাহ থাকতো, তবে এভাবে সরলমতি ক্রেতাগণকে অস্বাভাবিক চড়াদামে পণ্য ক্রয় করতে হ'তো না।

৫. উৎপাদনের চারটি উপাদানের মধ্যে তিনটির (শ্রম, মূলধন এবং ব্যবস্থাপকীয় দক্ষতা) পূর্ণ গতিশীলতা মুক্তবাজার অর্থনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই উপাদান সমূহের পূর্ণগতিশীলতা-জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় প্রেক্ষাপটেই অপরিহার্য। বস্তুত এই গতিশীলতা না থাকলে জাতীয় এবং বিশ্ব অর্থনৈতিক সম্পদের সবচেয়ে দক্ষ সমাবেশ (Allocation) সম্ভব হবে না। বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট মহলের উচিত হবে, বিশ্বঅর্থনীতির গতি-প্রকৃতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে সেই অনুযায়ী উৎপাদনের তিনটি স্থানান্তরযোগ্য উপাদান-শ্রম, মূলধন এবং ব্যবস্থাপকীয় দক্ষতাকে বাংলাদেশের জন্য প্রয়োজনীয় মাত্রায় গতিশীল করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইনগত এবং প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৬. রাস্তাঘাট, পয়:প্রণালী গ্যাস-বিদ্যুত-পানি সরবরাহ, যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থা, ব্যাংক-বীমা-আইন-শৃঙ্খলাগত পরিবেশ, শিক্ষার মান-এ সবই আর্থ-সামাজিক অবকাঠামোর বিভিন্ন অংশ, এ সবের সমষ্টিগত উন্নয়ন সাধিত হ'লে তবেই একটা দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবকাঠামোগত উন্নয়ন সম্ভব। বাংলাদেশের আর্থ-সামজিক অবকাঠামো নিঃসন্দেহে এখনও অনেক দুর্বল। বিশেষত যোগাযোগ, পরিবহন, বিদ্যুত সরবরাহ, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি-শিক্ষার

মান প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বর্তমানে এমনকি প্রতিবেশী দেশ সমূহের তুলনায়ও, অনেক পিছিয়ে রয়েছে।

৭. বাজার অর্থনীতি বিকাশের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক অঙ্গীকারের বিষয়টি খুবই গরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রের ক্ষমতাসীন এবং ক্ষমতা বহির্ভূত উভয় প্রকার রাজনৈতিক নেতৃত্ব যদি দেশে ব্যক্তিখাতের বিকাশে দক্ষ এবং দুর্নীতিমুক্তভাবে কাজ করার লক্ষ্যে ঐকমত্য পোষণ করে-তবে সংশ্লিষ্ট দেশে বাজার শক্তির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার তরান্বিত হয়। হালে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি দেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে এ কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। তাই বাংলাদেশের বহুধাবিভক্ত রাজনৈতিক শক্তিসমূহকে ব্যক্তিখাত ভিত্তিক উন্নয়ন কৌশলের মতো মৌলিক জাতিয় ইসু সমূহের ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ অবস্থান গ্রহণ প্রয়োজন। তা ছাড়া, দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্রের অধিকতর দক্ষতা এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি অর্জনের বিষয়টিও বাজার অর্থনীতির স্বচ্ছন্দ এবং গতিশীল বিকাশের স্বার্থে নির্মোহভাবে, গুরুত্বের সাতে বিবেচিত হবার দাবী রাখে।

বাণিজ্যিক ভূমিকায় বাংলাদেশের আমলাতন্ত্র

বাংলাদেশের অব্যবহিত রাজনৈতিক পূর্বসুরী পাকিস্তান তার জন্মালগ্ন থেকেই জনবিচ্ছিন্ন সামরিক-বেসামরিক আমলাতান্ত্রিক সরকারের নেতৃত্বে পরিচালিত হওয়ায় সেখানে 'সমাজতান্ত্রিক বিশ্বে'র অর্থনৈতিক দর্শন রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে তেমন সাড়া জাগাতে সমর্থ হয়নি। ফলে গোড়া থেকেই দেশটিতে যেমন ব্যক্তি মালিকানাধীন খাতের প্রাধান্য ছিলো, এখনও সে ধারাই অব্যাহত আছে। কিন্তু ব্যাপক গণআন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর বাংলাদেশ সরকার যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দরিদ্র দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সম্পদের অধিকতর সুষম বন্টণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং গণতন্ত্রের পাশাপাশি সমাজতন্ত্রকেও রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম মুলনীতিরূপে গ্রহণ করে। ফলে বাংলাদেশে ব্যক্তিখাতের সঙ্কোচন এবং রাষ্ট্রীয় খাতের প্রসারণ পর্বশুরু হয়; শুরু হয় বাজার অর্থনীতি থেকে মিশ্রঅর্থনীতির দিকে নিরীক্ষামুলক অভিযাত্রা। অবশ্য সেই অভিযাত্রার পেছনে অর্থনৈতিক কারণও ছিলো।

স্বাধীনতার ঠিক অব্যবহিত পরে বাংলাদেশে যুদ্ধজনিত তীব্র পণ্যঘাটতি এবং উদ্যোক্তার অভাব দেখা দেয়। পাকিস্তানী শিল্পপতি যারা এদেশের শিল্পকারখানা ব্যাংক, বীমা এবং বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পুর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করতেন, তারা তখন বাংলাদেশ ছেড়ে পাকিস্তানে চলে যান। তাদের অবর্তমানে দেশের বৃহদায়তন কল কারখানা, ব্যাংক, বীমা ও বৈদেশিক বাণিজ্য কার্যত অচল হয়ে পড়ে। সে সময়ে এই সব বৃহৎ প্রতিষ্ঠান চালাবার মতো মূলধন ও দক্ষতা সম্পন্ন স্থানীয় উদ্যোক্তা পাওয়া প্রায় অসম্ভব ছিলো। তাই ব্যাংক, বীমা বৈদেশিক বাণিজ্য এবং বৃহদায়তন শিল্পকারখানাসমূহ তৎকালে রাষ্ট্রায়ত্ব না করে সরকারের গত্যন্তর ছিলো না। তাছাড়া এই লক্ষ্যে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম মিত্র শক্তি অধুনালুপ্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের আর্থ-রাজনৈতিক প্রণোদনা তো ছিলোই। ফলে অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে (১৯৭২-৭৫) বাংলাদেশের রাজনৈতিক অর্থনীতির (Political

Economy) ইতিহাসে একটি গুরুতর পরিবর্তন সুচিত হলো। রাজস্ব আদায় এবং সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের পাশাপাশি রাষ্ট্র শিল্প উৎপাদক এবং ব্যবসায়ী ভূমিকা পালন করতে শুরু করলো, যেটা অন্য অনেক তৃতীয় বিশ্বের দেশ (যেমন-ভারত) বহুপূর্বেই আরম্ভ করেছিলো। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে শিল্পখাতে কাঁচামালের প্রচুর চাহিদা এবং ভোগ্যপণ্য ঘাটতি পরিপূরণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকার বৈদেশিক বাণিজ্যের বিরাট অংশ রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করেন এবং ১৯৭২ সালের ১লা জানুয়ারী রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য সংস্থা ট্রেডিং কর্পোরেশনে অব বাংলাদেশ (TCB) প্রতিষ্ঠা করেন। সরকার আদমজী, ইস্পাহানী, বাওয়ানী সহ সকল শিল্প গোষ্ঠীর বৃহৎ শিল্প ইউনিট সমূহ দেশের সকল ব্যাংকিং ও বীমা প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করেন এবং এগুলোর পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে 'Industrial Management Service' বা 'শিল্প ব্যবস্থাপনা সার্ভিস' নামে একটি স্বতন্ত্র ক্যাডার গঠন করেন, যা আইএমএস ক্যাডার নামে একদা পরিচিতি লাভ করেছিলো। এই নব গঠিত আইএমএস ক্যাডারের কর্মকর্তাগণকে সেই সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে (অধুনালুপ্ত) এবং পূর্ব ইউরোপের অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শিল্পব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ শেষে তারা দেশে ফিরে তৎকালে সদ্য রাষ্ট্রায়ত্ত্ব বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের ব্যবস্থাপনার ভার গ্রহণ করেন। এইভাবে আশির দশকের শুরুতে যুগপৎ রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক চাপের মুখে বাংলাদেশে মিশ্রঅর্থনীতির বিকাশ ঘটে এবং সরকার তথা আমলাতন্ত্র সেবা খাতের পাশাপাশি প্রথমবারের মতো ম্যানুফ্যাকচারিং খাতেও ব্যবসায় লিপ্ত হয়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, আমলাতন্ত্রের এই ব্যবসায়ীক ভূমিকা সম্পর্কে স্বাধীনতার বিগত পঁচিশ বছরে দেশবাসীর অভিজ্ঞতা খুব সুখকর নয়। তবে সান্ত্বনা এই যে, ব্যর্থতা কেবল বাংলাদেশের আমলাতন্ত্রের একার নয়, অনেক দেশেই আমলাতন্ত্র ব্যবসায়ী সাজতে গিয়ে বেকায়দায় পড়েছে।[৮] তবে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় খাতের ব্যর্থতা মুলত ব্যবস্থাপনাগত, যা অভিজ্ঞতাহীনতা এবং অঙ্গীকারহীনতা থেকে উদ্ভূত।

আশির দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে শিল্পোন্নত দাতাদেশসমূহ ঋণগ্রহীতা উন্নয়নশীল দেশসমূহকে চাপ দিতে থাকে স্ব স্ব দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সরকারী নিয়ন্ত্রণ হ্রাস করার জন্য। বাংলাদেশে সেই সময়ে (১৯৭৫) গুরুতর রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ঘটে। '৭৫ পরবর্তী সরকারসমূহ অর্থনীতির বাজারমুখী বিকাশের লক্ষ্য ঘোষণা করেন এবং ক্রমশ রাষ্ট্রায়ত্ব অলাভজনক বাণিজ্যিক ও শিল্প ইউনিটসমূহ হতে পুঁজি প্রত্যাহার করত সেগুলোকে আবার ব্যক্তিমালিকানার অধীনে ফিরিয়ে দেবার উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

ইতিমধ্যেই সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তি তথা স্নায়ু যুদ্ধের অবসান, দুই জার্মানীর পুনরেকত্রীকরণ, পূর্ব ইউরোপের সামাজতান্ত্রিক দেশসমূহের রাজনৈতিক

৮। Bureaucrats in Business. A World Bank Policy Research Report. edited by Mc.Donals. Lawrence et al. Oxford University Press. 1995. P.2-4.

পট পরিবর্তন, উপসাগরীয় যুদ্ধ, বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা, কম্পিউটার-স্যাটেলাইট এ্যান্টেনা-ই-মেইল- ইন্টারনেট প্রভৃতির মাধ্যমে যোগাযোগ ও তথ্য বিনিময় প্রযুক্তির অভূতপূর্ব বিকাশ প্রভৃতি বিভিন্ন ঘটনা এবং আবিস্কারের প্রেক্ষিতে আজকের বিশ্ব সত্যিই একটি 'বিশ্বপল্লীতে' (Global Village) পরিণত হয়েছে। বিশ্বায়নের (Globalization) এই স্বর্ণ যুগে পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রেই এখন বাজার অর্থনীতির পক্ষে তথা অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অতিরিক্ত রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অথবা হচ্ছে। দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি রাষ্ট্রের (দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর ইত্যাদি) সাম্প্রতিককালে অর্জিত অভাবনীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি উন্নয়নের সারথী হিসেবে বাজারমুখী অর্থনীতির আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের জনগণকে নিঃসংশয়ী করে তুলেছে। দক্ষিণ এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার জনগণ এখন আর রাষ্ট্রায়ত্ব সেক্টর কর্পোরেশনসমূহে ভর্তুকি যোগাতে রাজী নয়। তাই এখন কথা উঠেছে মিশ্র অর্থনীতি থেকে মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে ফিরে যাবার ক্ষেত্রে আমলাতন্ত্রের ভূমিকা নিয়ে। কথা উঠেছে মুক্তবাজার অর্থনীতিতে ফিরে যাবার পরে আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা, কতর্ব্যের পরিধি ও কাঠামোগত সংস্কার নিয়ে।

ব্যবসায়ী হিসেবে রাষ্ট্রের ব্যর্থতাঃ কয়েকটি দৃষ্টান্ত [৯]

অনেক উন্নয়নশীল দেশে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পেছনে বিপুল পরিমাণ তহবিল ব্যয়িত হয়, যে অর্থ মৌলিক সামাজিক সেবা প্রদায়ী খাত সমূহের উন্নয়নে আরও দক্ষভাবে ব্যয়িত হতে পারতো। তানজানিয়ার কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রতিবছর রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহে ভর্তুকি হিসেবে দেয় অর্থের পরিমাণ সে দেশের বার্ষিক শিক্ষা খাতের মোট ব্যয়ের ৭২% এবং স্বাস্থ্যখাতের মোট ব্যয়ের ১৫০%।

রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক বিপুল পরিমাণ ঋণ গ্রহণের প্রবণতা প্রায়শঃই বেসরকারী খাতের ঋণগ্রহণের সুযোগকে সঙ্কুচিত করে ফেলে। বাংলাদেশে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের ২০% গ্রহণ করে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহ। অথচ দেশের মোট বার্ষিক উৎপাদনে (GDP) এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সম্মিলিত অবদান ৩ শতাংশেরও কম।

রাষ্ট্রীয় কারখানাসমূহ প্রায়শঃই ব্যক্তিমালিকানাধীন কারখানার চেয়ে বেশী পরিবেশ দুষণ করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ ইন্দোনেশিয়ার কথা বলা যায়। সেখানে সমান আয়তন ও প্রকৃতির ব্যক্তিমালিকানাধীন কারখানার বর্জ্যের চেয়ে রাষ্ট্রীয় কারখানা কর্তৃক পরিত্যক্ত বর্জের দ্বারা পানি দুষণের পরিমাণ পাঁচগুণ বেশী।

রাষ্ট্র পরিচালিত বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহ আরেকটু দক্ষতা অর্জন করলে বেশীর ভাগ উন্নয়নশীল দেশেই রাজস্ব ঘাটতি উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কমে আসবে এবং কয়েকটি দেশের ক্ষেত্রে রাজস্ব ঘাটতি পুরোপুরি নির্মূল করা

৯ I bid P-P. 1 -2

সম্ভব হবে। মিশর, পেরু, সেনেগাল এবং তুরস্কে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনার ব্যয় ৫% হ্রাস করা সম্ভব হলে এসব দেশের রাজস্ব ঘাটতি প্রায় এক তৃতীয়াংশ কমে যাবে।

মুক্তবাজার এবং বিরাষ্ট্রীকরণ ঃ কতিপয় তথ্য চিত্র

বাজারমুখী অর্থনীতিতে যেতে হলে মাথাভারী রাষ্ট্রায়ত্ব খাতের লোকসানগ্রস্ত ইউনিটসমূহ বিরাষ্ট্রীয়করণ করে, ভর্তুকির মেদ বাহুল্য ঝরিয়ে, তন্বী হতে হবে। উন্নয়নশীল দেশসমূহ এখন দ্রুত বিরাষ্ট্রীয়করণ করতে চাইলেও বাস্তবায়নের পথে অনেক বাধা আসছে। খুব কম সংখ্যক দেশেই এ যাবত বিরাষ্ট্রীয়করণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করতে পেরেছে। বিশ্বব্যাংকের সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় জানা যায় ঃ[১০]

- উন্নয়নশীল দেশসমূহের প্রত্যেকে গড়ে বছরে তিনটি করে রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প ইউনিট থেকে পুঁজি প্রত্যাহারে সক্ষম হচ্ছে-যদিও এসব দেশের রাষ্ট্রায়ত্ব ইউনিটের সংখ্যা শত শত।
- যদিও রাষ্ট্রায়ত্ত্ব বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহের লোকসানের পরিমাণ ক্রমশ কমছে তবুও এখন পর্যন্ত এগুলো উন্নয়নশীল দেশ সমূহের সরকারের ঘাড়ে অন্যতম বোঝা হয়ে রয়েছে।
- কিছু বৃহদায়তন কারখানা ব্যক্তিমালিকানায় হস্তান্তর সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত উন্নয়নশীল দেশ সমূহের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (জিডিপি) ১১% উৎপাদিত হচ্ছে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব খাতে। পক্ষান্তরে শিল্পোন্নত বিশ্বের জিডিপিতে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের অবদান সাম্প্রতিককালে ৯% থেকে কমে ৭% এর নীচে এসে দাড়িয়েছে।
- উন্নয়শীল বিশ্বের দরিদ্রতম দেশগুলোর ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব খাতের সমস্যা বেশী প্রকট। এসব দেশের জিডিপিতে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের অবদান ১৪%।

বিরাষ্ট্রীয়করণ এবং বাংলাদেশের আমলাতন্ত্র

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে সরকার যে দর্শন এবং উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ঢালাওভাবে রাষ্ট্রীয়করণ কর্মসূচি গ্রহণ করার মাধ্যমে বাজার অর্থনীতির পথ থেকে সরে এসেছিলেন, সেটা নানা আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় ঘটনার সংঘাতে সফল হতে পারেনি। সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের বার্ষিক লোকসান আজ তাই বিশাল অংকের (জিডিপির প্রায় ২%) এবং তাদের অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ জিডিপির৯০%।[১১] পরিবর্তনশীল বিশ্বে বিশেষ করে রাজনীতি এবং অর্থনীতির মতো সদা বিকাশমান ক্ষেত্রে শেষকথা বলে কিছু নেই, থাকতে পারে না। তাই আজকের বিশ্বে বাজার

---

১০ Ibid. p.2

১১ Government that Works. A World Bank Publication. UPL. PXV

অর্থনীতির মাধ্যমে দ্রুত এবং টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে মডেল হয়েছে তাকে খোলা মনে গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন অনমনীয়তা প্রদর্শন করা অনুচিত। বাংলাদেশের আমলাতন্ত্র আশির দশকের শেষ দিক থেকে বাজার অর্থনীতির দিকে জোরে শোরে যাত্রারম্ভের কথা বললেও বাস্তবে গত দুই দশকে এই ক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়েছে সামান্যই। আদমজী পাটকলের মতো অনেক বড় বড় লোকসান প্রদায়ী ইউনিটকে এখনও ব্যক্তি মালিকানায় হস্তান্তর করা যাচ্ছে না। এর কারণ দ্বিবিধ, এক, সরকারী কর্মকর্তাগণ প্রেষণে এই সব শিল্প প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ ব্যবস্থাপনায় দীর্ঘ দুই দশকের বেশী সময় ধরে কর্মরত থাকার সময়ে দেখেছেন যে সংশ্লিষ্ট শিল্প ইউনিটের লাভ লোকসান যাই হোক না কেন, তাতে তাদের প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধার কোন ব্যত্যয় ঘটে না-বরং রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিটের দায়িত্বে থাকলে অনেক ক্ষেত্রে আকর্ষণীয় সুযোগ সুবিধা মেলে। তাই এই সব কারখানার প্রতি তাদের এক ধরনের আগ্রহবোধ রয়েছে।

দুই, দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্প খাতে ইতোমধ্যেই বিপুল পরিমাণ ছদ্ম কর্মসংস্থান (Disguise Employment) ঘটেছে। ফলে এই শিল্প ইউনিটসমূহ ব্যক্তি মালিকানায় হস্তান্তরিত হলে উৎপাদনের দৃষ্টিকোণে প্রয়োজনাতিরিক্ত সংখ্যক শ্রমিক কর্মচারী তাদের বর্তমান চাকুরি হারাতে বাধ্য। তাই এই চাকুরি হারানোর আশংকায় তারা বিরাষ্ট্রীয়করণ কর্মসূচিকে যে কোন মূল্যে প্রতিহত করতে চায়।

এমতাবস্থায় বাংলাদেশের মুক্ত বাজার অর্থনীতির বিকাশ তথা বিরাষ্ট্রীয়করণ কর্মসূচি তরান্বিত করতে হলে আমলাতন্ত্রের লাগসই সংস্কার সাধন এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের দৃঢ় জনমর্থনপুষ্ট অগ্রণী ভূমিকার মাধ্যমে প্রাইভেটাইটজেশন বোর্ডের কর্মকান্ডকে গতিশীল করে তোলার কোন বিকল্প নেই।

বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণ ও বাংলাদেশের আমলাতন্ত্র

সম্প্রতি বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশের সরকারী খাতের সংস্কারের লক্ষ্যে একটি খসড়া কর্মসূচি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছে। যার শিরেনাম "Government That Works"। এই বইয়ের নির্বাহী সারসংক্ষেপে ব্যক্ত করা হয়েছে বাংলাদেশ সরকারে সাফল্য ও ব্যর্থতার খতিয়ান। এতে সরকারের ভাবমূর্তিসহ কতিপয় উল্লেখযোগ্য তথ্য তুলে ধরা হয়েছে,[১২] যেমন-সরকার সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা হচ্ছে, এটা প্রক্রিয়া নিয়ে অতিমাত্রায় ব্যতিব্যস্ত; অতিশয় পরিব্যাপ্ত; অত্যন্ত কেন্দ্রীভূত; অতিমাত্রায় আমলাতান্ত্রিক; অতিশয় স্বেচ্ছাচারী; অ-জবাবদিহিমূলক ও অমনোযোগী এবং অপচয়কারী একটি প্রতিষ্ঠান।

- ১৫০০ শহুরে/গ্রামীণ পরিবারের একটি জাতীয় প্রতিনিধিত্বকারী নমুনা জরীপে জানা গেছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সম্প্রসারণ সেবাসহ প্রায় সকল ক্ষেত্রে সরকার প্রদত্ত সেবাসমূহ এন জি ও এবং বেসরকারী খাতের দেয়া সেবা থেকে নিম্নমান সম্পন্ন।
- ২০০ জন ব্যবসায়ী এবং ৭০জন রপ্তানীকারকের ওপরে পরিচালিত একটি

---

১২ Ibid. p. 15

জরীপ থেকে দেখা গেছে-সরকারী সংস্থাগুলোর সাথে লেনদেনের ক্ষেত্রে সংঘটিত দীর্ঘসুত্রিতাজনিত বিলম্বের জন্য দুই-তৃতীয়াংশ রপ্তানীকারক রপ্তানী অর্ডার হারিয়েছে এবং সরকারী সংস্থার সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় দ্রুতি সঞ্চার করার জন্য রপ্তানীকারকগণ গড়ে তাদের বিক্রীলব্ধ আয়ের ৭% অর্থ ব্যয় করেন, বিশ্বব্যাংকের আলোচ্য গ্রন্থের ভাষায়, 'Speed money' হিসেবে।

০ এছাড়া দেশে বিদ্যুৎবিভ্রাট সামাজিক এবং আর্থিক অবকাঠামোগত অপ্রতুলতা, আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির শৈথিল্য, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা প্রভৃতি তো রয়েছেই। এমতাবস্থায়, সব মিলিয়ে বলা যায় যে গত পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরে বাংলাদেশে বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার মতো পরিবেশ সৃষ্টিতে আমলাতন্ত্রের সাফল্য সামান্যই, যদিও সাম্প্রতিককালে সৃষ্ট ইপিজেড সমূহ হতাশার সমুদ্রে বাতিঘরের ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

ইপিজেড এবং বাংলাদেশের আমলাতন্ত্র

বাজার অর্থনীতির অধিকতর বিকাশের জন্য বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই। তাই সরকার ১৯৮০সালে বাংলাদেশে রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ এ্যাক্ট (BEEPZA Act, 1980)প্রণয়ন করেন, যা ১৪ই এপ্রিল ১৯৮১ থেকে কার্যকর হয়। সরকার প্রাথমিক পর্যায়ে রাজধানী ঢাকা এবং বন্দর নগরী চট্টগ্রাম ও খুলনায় একটি করে মোট তিনটি রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (EPZ) স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। কিন্তু দেশে ১৯৮৩ সালে চট্টগ্রাম ইপিজেড এবং ১৯৯৩ সালে সাভারে ঢাকা ইপিজেড প্রতিষ্ঠিত হলেও এখন পর্যন্ত প্রস্তাবিত খুলনা ইপিজেড প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি। চট্টগ্রাম ও ঢাকা ইপিজেড এ ১৯৯৩-৯৪ সাল পর্যন্ত মোট বিনিয়োগের পরিমাণ যথাক্রমে ১২২·৭৪ মিলিয়ন এবং ২০.২৪ মিলিয়ন ডলার।[১৩] কিন্তু বিনিয়োগের পরিমাণ আরও বহুগুণ বৃদ্ধির অবকাশ রয়েছে। সম্ভাব্য বিদেশী বিনিয়োগকারীদের কাছে বাংলাদেশের ইপিজেডসমূহ সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ কর্তৃপক্ষ এবং বিনিয়োগ বোর্ড কর্তৃপক্ষকে আরও তৎপর হতে হবে এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে শিল্পোন্নত দেশসমুহে বিনিয়োগ সম্পর্কিত সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা প্রভৃতির আয়োজনের মাধ্যমে বিদেশী বিনিয়োগকারীগণকে আকৃষ্ট করতে হবে।

ইপিজেড এবং বাংলাদেশ বিনিয়োগ বোর্ড কর্তৃপক্ষ বহুল প্রচারিত আন্তর্জাতিক দৈনিক এবং সাময়িকীসমূহে বিজ্ঞাপন প্রদানের মাধ্যমেও দেশের ইপিজেডসমূহকে

---

১৩ Islam. Nazneen. "Export Processing Zone in Bangladesh: A descriptive view. 1997

বিশ্বব্যাপী পরিচিত করে তুলতে পারেন। তাছাড়া বিদেশী বিনিয়োগকারীগণ যাতে দেশের ইপিজেডসমূহে বাস্তবিকই 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস' (One-stop service)পান, তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে আমলাতন্ত্রের ভূমিকা অসীম। উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতা পেলে মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে ইপিজেডসমূহ হয়ে উঠতে পারে জাতীয় উন্নয়নের সারথী।

মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের আমলাতন্ত্রের কাম্য ভূমিকা ঃ কতিপয় প্রস্তাবনা

o রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো, বিনিয়োগ বোর্ড ও রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ কর্তৃপক্ষকে অধিকতর সক্রিয় হতে হবে এবং স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনে সচেষ্ট হতে হবে।

o বিরাষ্ট্রীয়করণ বোর্ডকে অধিকতর দ্রুততা এবং বৈষয়িকতার সাথে লোকসান গ্রস্ত রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প ইউনিটসমূহ বেসরকারী খাতে হস্তান্তর করতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে দ্রুতি রক্ষা করতে গিয়ে যেন সরকারকে কোন শিল্প ইউনিট বাজার মূল্যের চেয়ে কম দামে বেসরকারী খাতে হস্তান্তর করতে না হয়।

o প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারী খাতে উপদেষ্টা কাউন্সিল গঠন করতে হবে।

o আমদানী এবং রপ্তানী নীতি যথা সম্ভব উদার করতে হবে। দেশীয় শিল্পের সেই সব শাখাকে প্রোটেকশন দিতে হবে যে সব শাখায় বাংলাদেশের নিরঙ্কুশ অথবা তুলনামূলক সুবিধা (Absolute or Comparative Advantage) রয়েছে।

o দেশে বিভাগীয় পর্যায়ে এবং সম্ভব হলে জেলা পর্যায়ে বিশ্ব শ্রমবাজারের চাহিদার আলোকে জনশক্তি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে এবং প্রশিক্ষণ শেষে দক্ষ জনশক্তিকে বিদেশে উপযুক্ত কর্মসংস্থান খুঁজে পাওয়ার ক্ষেত্রে সরকারকে সম্ভাব্য সকল প্রকার সহযোগিতা দিতে হবে।

o ক্রেতা বিক্রেতা এবং ভোক্তা ও উৎপাদককে স্ব স্ব অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলার দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে।

o গণমাধ্যমসমূহে অবাধে পর্যাপ্ত এবং সঠিক তথ্য পরিবেশনের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। কেননা, তথ্যের পর্যাপ্ততা, নির্ভুলতা এবং সহজলভ্যতা হলো মুক্তবাজার অর্থনীতি বিকাশের অন্যতম পূর্বশর্ত। তথ্য বিপ্লবের এই যুগে সরকারী-বেসরকারী দপ্তর এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে Computerized এবং Eletronic Data Exchange Network গড়ে তুলতে হবে।

o সরকারী সংস্থা সমূহের মধ্যকার পারস্পরিক সমন্বয়হীনতা দূর করতে হবে।

o দেশে আইনের শাসন কায়েম এবং দুর্নীতিকে যথাসাধ্য নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

o প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

উপসংহার

বাজার অর্থনীতির মূল কথা হলো, সরকার ব্যবসায়-বাণিজ্যের সুষ্ঠু তদারক করবে ঠিকই, কিন্তু নিজে ব্যবসায়ী সেজে বসবে না। তাই ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প ইউনিট সমূহের পাশাপাশি টেলিফোন, বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি প্রভৃতি ইউটিলিটি সার্ভিস উৎপাদন এবং বিক্রয়ের সংস্থাসমূহকেও ক্রমান্বয়ে দক্ষ বেরসকারী ব্যবস্থাপনার হাতে ছেড়ে দিতে হবে।[১৪]

দেশের কর রাজস্ব ও অ-কর রাজস্ব উভয় প্রকার প্রশাসনে যুগোপযোগী সংস্কার করা হলে নতুন করে কর আরোপ বা প্রদেয় সেবার একক মূল্য বৃদ্ধি ব্যতীতই বিপুল পরিমাণ টার্নওভার নিশ্চিত করা সম্ভব। এই বর্ধিত রাজস্ব দেশের বেসরকারী শিল্পখাতে সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণ প্রদানের তহবিল যোগাতে সক্ষম হবে। ফলে দেশে শিল্পায়নের হার বৃদ্ধি তথা জিডিপি ও কর্মসংস্থানের পরিমাণ যেমন বৃদ্ধি পাবে, তেমন বাড়বে মাথাপিছু আয় এবং জাতীয় প্রবৃদ্ধি তথা উন্নয়নের হার।

এইসব পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সদিচ্ছা, দক্ষতা, দূরদর্শিতা ও সমকালীন বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গীর পাশাপাশি প্রয়োজন দৃঢ় জনসমর্থনপুষ্ট রাজনৈতিক অঙ্গীকার। তাছাড়া দারিদ্র্যের অমানিশা ভেদ করে উন্নয়নের সোনালী প্রভাতের দিকে বাংলাদেশকে চালিত করতে হলে আজকের বিশ্ব বাস্তবতায় মুক্তবাজার অর্থনীতিকে তার যোগ্য আসন দিতেই হবে। এ কথা সত্যি যে, আইন প্রণীত হয় সংসদে, কিন্তু আইনের খসড়াটি করেন সরকারী কর্মকর্তাবৃন্দ। আবার প্রণীত আইনও প্রয়োগ করেন তারাই। এই গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানগত কারণে মুক্তবাজার অর্থনীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ জাতীয় আমদানী রপ্তানী নীতি, শিল্পনীতি, বাণিজ্য নীতি, রাজস্ব নীতি প্রভৃতি প্রণয়নে ও বাস্তবায়নে সরকারী কর্মকর্তাগণ রাখতে পারেন বিশাল এবং সুদূরপ্রসারী ইতিবাচক ভূমিকা। একবিংশ শতকে প্রবেশের মাহেন্দ্রক্ষণে দাড়িয়ে বাংলাদেশের আমলাতন্ত্র তার ইতিহাস নির্ধারিত ভূমিকা পালনে অধিকতর সৃজনশীলতার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হবে-এমনটা প্রত্যাশা করা নিশ্চয়ই অসংগত হবে না।

১৪। মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে সরকারী কর্মকর্তাদের ভূমিকা ঃ দলীয় আলোচনা প্রতিবেদন, (গ্রুপ নং-২) বুনিয়াদি নবায়ন কোর্স (৫-৭ জানুয়ারী, ১৯৯৭), বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা।

গ্রন্থপঞ্জি

১। *১৯৯০ এর দশকে বাংলাদেশকে উন্নয়ন কৌশল সম্পর্কিত ২৯টি টাস্কফোর্সের রিপোর্ট, (চারখন্ড)*, ইউপিএল, ঢাকা, ১৯৯১।

২। *বাংলাদেশ-একটি দক্ষ সরকারের রূপরেখা (সরকারি খাতের সংস্কার), একটি বিশ্ব ব্যাংক প্রকাশনা*, ইউপিএল, ঢাকা, ১৯৯৬।

3. Grieve. R. H. and Huq. M. *"Bangladesh : Strategies for Development"* UPL. Dhaka. 1995.

4. Mandal. Dr. R. *"Privatization in the Third World.* Vikas Publishing House. New Delhi. 1994.

5. *"Privatizing Public Enterprises"* (Edited). RIPA. London. 1984. Steel. David and Heald. David.

6. Sobhan. Rehman. *"Public Enterprise and the Nature of the State,"* Centre for Social Studies. Dhaka. 1983.

লোক প্রশাসন সাময়িকী
৯ম সংখ্যা, জুন ৯৭, আষাঢ় ১৪০৪

উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকৃতি, গতিধারা ও বিবর্তন

ডঃ মীর ওবায়দুর রহমান*

ভূমিকা

উন্নয়ন পরিকল্পনা একটি প্রক্রিয়া। সীমিত-সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে পর্যায়ক্রমে উন্নয়নের বিভিন্ন ধাপে পৌঁছে দেয়াই হচ্ছে এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নই উন্নয়ন পরিকল্পনার মুল লক্ষ্য। আর জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন প্রকৃত মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির মধ্যে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অবশ্যই প্রকৃত মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হারকে অতিক্রম করতে পারবে না। উন্নয়ন পরিকল্পনায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি সীমিত রাখার সরকারী কর্মপন্থা এ দিকটির উপরই গুরুত্ব আরোপ করে।

উন্নয়ন পরিকল্পনায় একটি দেশের সঠিক উন্নয়নের রূপরেখা বিধৃত হয়। বিভিন্ন খাত যেমন কৃষি, শিল্প, পানি সম্পদ, বিদ্যুৎ, সামাজিক অবকাঠামো ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নে পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় বিভিন্ন কর্মপন্থা (strategies) গ্রহণ করা হয় এবং এ সমস্ত কর্মপন্থা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্থিরীকৃত নীতিমালাসমুহের বিশদ আলোচনা পরিকল্পনা দলিলে স্থান পায়।

পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নয়শীল দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য ১৯৭২ সালে একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি করা হয়। বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন প্রতিষ্ঠার সুচনালগ্নে ১৯৭৩ সালে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দলিলটি প্রণয়ন করা হয়। ঐ পরিকল্পনা দলিলটিতে বাংলাদেশের সংবিধানের মুল চারটি নীতির প্রতিফলন ঘটে। এই মূলনীতিসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি ক্যাডারের প্রয়োজনীয়তা এতে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দেশের উন্নয়ন কর্মকান্ডে সরকারী খাতের প্রাধান্য লক্ষ্যণীয়।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (১৯৭৩-৭৮) পর একটি দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৮-৮০) প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তীতে দেশে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ফলে পরিকল্পনা দলিলেরও কাঠামোগত পরিবর্তন সাধিত হয়। এরপর পর্যায়ক্রমিক পরিকল্পনা দলিল যথা-দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৮০-৮৫), তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৮৫-৯০) এবং চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯০-১৯৯৫) দলিলসমুহে সরকারী খাত থেকে বেসরকারী খাতের ভুমিকা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

---

* সদস্য, পরিচালন পর্ষদ, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দলিলটি মুলত একটি নির্দেশক (indicative plan) পরিকল্পনা দলিল। খসড়া এই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দলিলটিতে উদীয়মান বেসরকারী খাতকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে এবং মুক্ত বাজার অর্থনীতির নিয়ামকসমূহের যথাযথ বিকাশের পথ সুগম করা হয়েছে।

পরিকল্পনা প্রণয়নের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

অধুনালুপ্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দলিল প্রণয়ন করেছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাফল্য এই ধারণার জন্ম দেয় যে, পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে উন্নয়নের গতিধারাকে ত্বরান্বিত করা সম্ভব। প্রখ্যাত সুইডিশ অর্থনীতিবিদ গুনার মিরডালও এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের পরিকল্পনাকে অনুসরণ করে স্বল্পোন্নত দেশগুলিও উপকৃত হতে পারে। ১৯১৭ সালের বলশেভিক বিপ্লব সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক কাঠামোতে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন সূচিত করে। এই বিপ্লবের ফলে সে দেশের সার্বিক উৎপাদনের উপকরণসমূহ যেমন, ভুমি, শিল্প, কলকারখানা প্রভৃতি রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নিয়ে আসা হয়। পরিবর্তিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন উৎপাদনের উপকরণসমূহের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। পরিকল্পনা প্রণয়নে রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি (commitment) ১৯২৬ সালে ব্যক্ত হয় এবং প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দলিলটি ১৯২৯ সালে প্রকাশিত হয়।

বলশেভিক বিপ্লবের পর পরই রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন উৎপাদনের উপকরণসমূহ সংগঠিত করা সম্ভব হয়নি। সোভিয়েট ইউনিয়নের অর্থনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ১৯১৭ থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত দু'টি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার স্তর রয়েছে, যা যুদ্ধাবস্থার সাম্যবাদ (War communism) এবং নতুন অর্থনৈতিক কর্মপন্থা (New Economic Policy, NEP) নামে স্বীকৃত। সোভিয়েত অর্থনীতিবিদ মিঃ এ্যালেক নোভ ১৯১৭ হতে ১৯২১ এই সময়ের সোভিয়েত অর্থনীতিকে বদ্ধ অর্থনীতি (seize economy) বলে বর্ণনা করেছেন, যেখানে কমিউনিজমের অতন্দ্র প্রহরীরা মুক্ত বাজার অর্থনীতির বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রতিস্থাপনে সদা তৎপর ছিল। ভি. আই. লেনিন প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট ক্ষমতার অধিকারী হলেও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় কোন সুদূরপ্রসারী অবদান রাখতে পারেননি। যুদ্ধাবস্থার সাম্যবাদের এই গতি সোভিয়েত অর্থনীতিতে এক বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ১৯১৩ সালের কৃষি ও শিল্পের প্রকৃত উৎপাদন থেকে ১৯২১ সালের শিল্পজাত পণ্যের উৎপাদন এক-তৃতীয়াংশ এবং কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন দুই-তৃতীয়াংশ হ্রাস পায়। যার ফলে ১৯২১ সালে অনুষ্ঠিত পঞ্চম পার্টি কংগ্রেসের অধিবেশনে যুদ্ধাবস্থা সাম্যবাদের অবলুপ্তি ঘোষণা করে এক নতুন অর্থনৈতিক নীতি (New Economic Policy) গ্রহণ করা হয়। ভি. আই. লেনিনই মুলত এই নতুন অর্থনীতির প্রবক্তা ছিলেন যা ১৯২৪ সাল পর্যন্ত বলবৎ ছিল। লেনিনের ভাষায়-

"We must arrange things in such a way that the regular operation of the economy and patterns of exchange charcteristics of capitalism become possible. It must be so for the sake of the people. Otherwise we should not be able to live". (V. I. Lenin, Collected Works, XLV 1970, pp-86)

নতুন অর্থনৈতিক নীতির অধীনে পরিকল্পনার ধারণা স্বচ্ছ ছিল না, কারণ পরিকল্পনা প্রণয়নে মুল উপাদান উপাত্তের (Data) যথেষ্ট অভাব ছিল। এতদসত্ত্বেও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের ধারাকে বিকেন্দ্রীকরণের কোন প্রচেষ্টাই গ্রহণ করা হয়নি। শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ ১৯১৮ সালে স্থাপিত শ্রম ও প্রতিরক্ষা কাউন্সিল (Council of Labour and Defence, STO) এর নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিল। ১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে শ্রম ও প্রতিরক্ষা কাউন্সিলের একটি অংগ সংগঠন হিসেবে পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর রূপ নেয় যা 'গসপ্লান' (GOSPLAN) নামে পরিচিত, যদিও ১৯২০ সালের মার্চ থেকেই রাশিয়ায় বিদ্যুতায়নের জন্যে (State Commission for Electrification, GOELRO) এর অস্তিত্ব ছিল। ১৯২৪ সালে লেনিনের মৃত্যুর পর জোসেফ ষ্ট্যালিন ক্ষমতায় এলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিধারার দিক নির্দেশনায় বিতর্কের সূত্রপাত হয়। অবশেষে স্থির হয় যে, রাষ্ট্রই হবে উৎপাদনের সকল উপকরণের মালিক।

রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে বিভিন্নমুখি উৎপাদন কর্মকান্ড পরিচালনার পূর্বে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মুল চালিকাশক্তি ছিল বাজার ব্যবস্থা, যেখানে অর্থনৈতিক উন্নয়নের আবহমান ধারায় ব্যক্তি স্বার্থের বিষয়টিই ছিল মুখ্য। পণ্যের মুল্য সাধারণত চাহিদা এবং সরবরাহের পারস্পরিক প্রভাবের দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে। একই সাথে তা ভোক্তার ক্রয়ের সিদ্ধান্ত ও উৎপাদকের বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অপরদিকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে উৎপাদন ব্যবস্থায় দ্রব্য মূল্যের কোন প্রভাব নেই, সেখানে অগ্রাধিকার পায় নীতি নির্ধারকদের সিদ্ধান্ত বা বিবেচনা। এ ক্ষেত্রে উন্নয়ন কর্মকান্ডের দিক-নির্দেশনা পাওয়ার পর রাষ্ট্রীয় নীতির ভিত্তিতে সম্পদের বিভাজন হয়ে থাকে।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতিধারার হ্রাস-বৃদ্ধি বাজার অর্থনীতির মুল বৈশিষ্ট্য; যাকে পাশ্চাত্যের অর্থনীতিবিদগণ বাণিজ্যচক্র (business cycle) বলে অভিহিত করেছেন। বর্তমান শতাব্দীর ত্রিশ দশকের চরম অর্থনৈতিক মন্দা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই মন্দা হতে উত্তরণের পন্থা উদ্ভাবিত হয়েছিল কেইন্স এর Public Intervention Philosophy সরকারী হস্তক্ষেপের নীতির মাধ্যমে। কেইন্স প্রণীত *Theory of Employment, Interest & Money* পুস্তকে সরকারী খাতের হস্তক্ষেপের উপকরণসমূহের বিশদ আলোচনা রয়েছে। মূলত কেইন্স সরকারী খাতের মাধ্যমে কার্যকরী চাহিদাকে (Effective Demand) উজ্জীবিত করার পক্ষে মত দিয়েছেন। তাঁর এই দর্শনই পরবর্তী সময়ে পাশ্চাত্যের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে পাশ্চাত্য দেশসমুহের উন্নয়ন কর্মকান্ডসমূহ মার্শাল পরিকল্পনার অধীনে প্রণয়ন করা হয়েছিল। পাশ্চাত্যে মূলত পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার অবয়বেই এই পরিকল্পনা দলিল প্রণীত হয়েছিল, এর মূল উদ্দেশ্য ছিল মিত্র দেশসমূহের যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতিকে পুনর্বাসন করা। তবে এই পরিকল্পনা বাজার কাঠামোর আওতাধীনেই প্রণীত হয়েছিল। এই পরিকল্পনার পথিকৃৎ ফ্রান্সে উন্নয়ন কর্মকান্ডে যদিও সরকারী ভূমিকা অনেক পূর্ব হতেই স্বীকৃত ছিল, তথাপি যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতির পুনর্বাসনে ১৯৪৫ সালে নতুন আঙ্গিকে পরিকল্পনার আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা হয়। যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পদের অপ্রতুলতার কারণে বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন হয়ে পড়ে এবং প্রদত্ত সম্পদ যথাযথ ব্যবহারের লক্ষ্যে দাতা দেশসমূহ একটি পরিকল্পনার রূপরেখা প্রণয়নকে আবশ্যকীয় শর্ত হিসেবে আরোপ করে।

ফ্রান্সে প্রথম পরিকল্পনা দলিলটি প্রণীত হয় ১৯৪৬ সালে। ফরাসী অর্থনীতিবিদ 'জাঁ মনে' (Jean Monnet) পরিকল্পনা প্রণয়ন ধারণার জনক হিসেবে বিশ্বনন্দিত। সাত বছর মেয়াদী এই পরিকল্পনা দলিলটিতে মৌলিক শিল্পের জন্য কতকগুলি বিনিয়োগ কর্মসুচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতির পুনর্বাসনের উপর অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনা দলিল (১৯৫৪-৫৭) এর কর্মসূচি মৌলিক শিল্পে সীমাবদ্ধ না রেখে তা বহুবিধ শিল্পে সম্প্রসারিত করা হয়। তৃতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৫৮-৬১) দলিলটিতে সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়নে একটি পরিচ্ছন্ন ও সমন্বিত প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৬২-৬৫) দলিলে সামাজিক বিনিয়োগ এবং আঞ্চলিক উন্নয়নের নীতিসমূহ গুরুত্ব লাভ করে। এই পরিকল্পনা দলিলটির একটি যৌক্তিক অবয়ব ছিল যেখানে বিভিন্ন পণ্য সামগ্রীর উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক (১৯৬৬-৭০) পরিকল্পনায় পরিমাণগত লক্ষ্যমাত্রার সাথে সম্পদ ব্যবহারে সামঞ্জস্য বিধানের প্রচেষ্টা নেয়া হয় যা মূল্যমান পরিকল্পনা (Value Planning) নামে চিহ্নিত হয়। এই পরিকল্পনা দলিলটির যথাযথ বাস্তবায়নে পরিবীক্ষণ পদ্ধতির উপরও গুরুত্ব দেয়া হয়। ফ্রান্সের তদানীন্তন পরিকল্পনা দলিলসমূহ চারটি স্তরে প্রণয়ন করা হয়েছিল।

পরিকল্পনার প্রকৃতি ও ধরন

নব্বই এর দশকের পর পরিকল্পনার প্রকৃতিতে কাঠামোগত পরিবর্তন দেখা দেয়। সত্তরের দশকের পর থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে ক্রমাগত বিপর্যয় দেখা দেয়। এর বহুবিধ কারণ থাকতে পারে। প্রথমত, আফগানিস্তানে সোভিয়েত হস্তক্ষেপের ফলে খোদ সোভিয়েত ইউনিয়নের অভ্যন্তরেই এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। তাছাড়া, অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় সমাজতান্ত্রিক দর্শন পূর্ব ইউরোপের দেশসমূহে ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌছুতে ব্যর্থ হয়েছে।

১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে প্রথমে বাল্টিক দেশসমূহ এবং পরবর্তীতে অন্যান্য অঞ্চলসমূহ বিচ্ছিন্ন হবার সাথে সাথেই সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পূর্ব ইউরোপের দেশসমূহ সমাজতান্ত্রিক দর্শন হতে মুক্ত বাজার অর্থনীতির আবর্তে চলে আসে। অর্থনীতির এই রূপান্তর সনাতন পরিকল্পনার প্রকৃতিতে যথেষ্ট পার্থক্য এনে দেয়। মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে সম্পদ আহরণ এবং বন্টন মূল্য-নির্ভর হয়ে পড়ে।

তদানীন্তন সোভিয়েত ইউনিয়নে পরিকল্পনা দলিলসমূহ সুপ্রীম সোভিয়েত এর অনুমোদন সাপেক্ষে আইন হিসেবে স্বীকৃতি পেত। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীনে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ, কৃষিযোগ্য আবাদভুমি এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক ইউনিটসমূহে উৎপাদনের পরিমাণগত লক্ষ্য বেঁধে দেয়া হ'ত এবং এই লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজনীয় উৎপাদন উপকরণ রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সরবরাহ করা হ'ত। সে জন্য সোভিয়েত পরিকল্পনাকে Planning by Inducement বলা হ'ত যা Imperative Plan নামে স্বীকৃত ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের উন্নয়ন পরিকল্পনা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, উৎপাদনের উপকরণসমূহের ব্যবহার যথেষ্ট বৃদ্ধি পেলেও উৎপাদন (Output) এ তার যথাযথ প্রতিফলন ঘটেনি। সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় Innovation বা প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ সাধনের তেমন কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি। এর জন্যে উৎপাদন ব্যবস্থায় Incentive structure বা ব্যক্তিস্বার্থের অনুপস্থিতি বহুলাংশে দায়ী।

উন্নয়নের উপকরণসমূহ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন থেকে ব্যক্তি নিয়ন্ত্রণাধীনে চলে আসার কারণে পরিকল্পনার প্রকৃতিতে কাঠামোগত পরিবর্তন সূচিত হয়। উন্নয়ন প্রক্রিয়ার এই বিবর্তনে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে চাপ প্রয়োগের (enforcement) এর যে গুরুত্ব ছিল তা শিথিল হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে পরিকল্পনা দলিলটি দিক নির্দেশনার ভূমিকা গ্রহণ করে। পরিকল্পনা প্রণয়নে মুক্ত বাজার অর্থনীতির নিয়ামকসমূহ সম্পদের বিভাজনে মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে। রাষ্ট্র এক্ষেত্রে শুধুমাত্র বাস্তবভিত্তিক নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে উন্নয়নের গতিধারাকে ত্বরান্বিত করার অনুঘটক হিসেবে ভূমিকা পালন করে। এ ধরনের পরিকল্পনাকে নির্দেশক পরিকল্পনা বা 'indicative plan' বলা হয়ে থাকে।

বর্তমান বিশ্বে পুরোপুরি সমাজতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদি অর্থনৈতিক কাঠামো অধিকাংশ দেশেই অনুপস্থিত। সেজন্য অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশেই মিশ্র-অর্থনীতির কাঠামোতে পরিকল্পনা দলিল প্রণীত হয়ে থাকে। যেমন-বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশে মিশ্র-অর্থনীতির অবয়বে পরিকল্পনা দলিল প্রণীত হয়। মিশ্র-অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীন বেশ কিছু কলকারখানা এবং শিল্প প্রতিষ্ঠান থাকে, যাকে 'Economy's Command Height' বলা হয়ে থাকে। বাংলাদেশসহ অনেক উন্নয়নশীল দেশেই কোন কোন সরকারী উপযোগ (Public Utility) সমূহ এখনও রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীনে রয়েছে। সরকারী উপযোগে (Public Utility) উৎপাদিত পণ্যসামগ্রি ও সেবার মূল্য নিরূপণে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ থাকে। মিশ্র-অর্থনীতির পরিকল্পনায় কোন কোন পণ্যদ্রব্যের মূল্যস্তর নিরূপণ সম্পূর্ণ বাজার নিয়ন্ত্রণাধীন এবং কোন কোন পণ্যের মূল্য নিরূপণে বাজার নিয়ামকসমূহের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি থাকে যা সার্বিক সম্পদ বিভাজনের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। সেজন্যে অধিকাংশ বহুজাতিক দাতাসংস্থাসমূহ সম্পদের বিভাজনে পুরোপুরিভাবে বাজার ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল হওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অবয়ব এবং উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণের উপর নিয়ন্ত্রণের আলোকে পরিকল্পনা দলিলকে দু'টি আলাদা বৈশিষ্ট্যে দেখা যায়-

ক) সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং (খ) পুঁজিবাদী ব্যবস্থা।

ক) সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ঃ সামগ্রিক এবং সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রণীত বহুবিধ লক্ষ্য অর্জনের জন্য পরিকল্পনা দলিল প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। মিশ্র অর্থনীতির পরিকল্পনায় বাজার ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ পাশাপাশি অবস্থান করে।

খ) পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ঃ সমষ্টিগত অর্থনীতির নিয়ামকসমূহের ভারসাম্য মুদ্রানীতি এবং রাজস্বনীতি পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আনয়ন করা হয়। বিষয়টি অনেকাংশে নির্দেশক পরিকল্পনার (Indicative Plan) অনুরূপ। এই জাতীয় পরিকল্পনা দলিলে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নিয়োজিত ইউনিটসমূহকে প্রয়োজনীয় তথ্য পরিবেশন করা হয়, যা বাজার ব্যবস্থায় অনেক সময়ই স্বয়ংক্রিয়ভাবে থাকে না।

সময়ের ভিত্তিতে পরিকল্পনার বিভাজন

সময়ের ভিত্তিতে পরিকল্পনা দলিলকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন(ক) বার্ষিক পরিকল্পনা, (খ) অন্তর্বর্তীকালীন পরিকল্পনা এবং (গ) প্রেক্ষিত পরিকল্পনা।

ক) বার্ষিক পরিকল্পনা (Annual Plan): এক বছরের জন্য প্রণীত পরিকল্পনাকে বার্ষিক পরিকল্পনা বলা হয়। বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন থেকে সত্তুর দশকের শেষ অবধি বার্ষিক পরিকল্পনা দলিল প্রণয়ন করা হয়েছিল। বর্তমানে বাংলাদেশে বার্ষিক পরিকল্পনা দলিল প্রণয়ন করা হয় না। উন্নয়ন কর্মকান্ডের জন্য বৎসরভিত্তিতে বরাদ্দকৃত অর্থ যা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে খাতওয়ারীভিত্তিতে তুলে ধরা হয়, সেটি বার্ষিক পরিকল্পনার বিকল্প নয়। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে শুধুমাত্র প্রকল্পভিত্তিতে সম্পদের খাতওয়ারী বরাদ্দ দেয়া হয়। উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা বা সম্পদ আহরণের উপর কোন দিক নির্দেশনা থাকে না।

খ) অন্তর্বর্তীকালীন পরিকল্পনা (Intermediate Range Plan)

অন্তর্বর্তীকালীন পরিকল্পনা দলিল চার, পাঁচ অথবা চয় বছর মেয়াদী হতে পারে। ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, বাংলাদেশ প্রভৃতি দেশের অন্তর্বর্তীকালীন পরিকল্পনা দলিল মূলত পাঁচ বছর মেয়াদী হয়ে থাকে। পাঁচ বছর মেয়াদী এই পরিকল্পনা দলিলে পরিকল্পনাকালীন মোট ব্যয়ের বৎসরভিত্তিতে বিভাজন এবং কোন কোন সময়ে ভৌত লক্ষ্যমাত্রার বৎসরভিত্তিতেও বিভাজন থাকে। এই ধরনের পরিকল্পনা দলিলের কাঠামোতে সামষ্টিক অর্থনীতির পর্যালোচনা প্রথমাংশে থাকে এবং দ্বিতীয়াংশে বিভিন্ন খাতের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার উপর ব্যষ্টিক (Micro) আলোচনা থাকে।

গ) প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (Long Term Plan)

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বা দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার বিস্তৃতি ১৫ থেকে ২০ বছর মেয়াদী হতে পারে। অন্তর্বর্তীকালীন পরিকল্পনায় অর্থনীতির কোন সুদূর প্রসারী দিক নির্দেশনা নাও থাকতে পারে। সেজন্যে দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা দলিল প্রণয়নের প্রয়োজন দেখা দেয়। বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৫ সালে একটি দীর্ঘ মেয়াদী প্রেক্ষিত পরিকল্পনা দলিল প্রণয়ন করেছিল কিন্তু সরকার পরিবর্তনের পর এই বিষয়ে আর কোন অগ্রগতি হয়নি। বর্তমান সরকারের পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার খসড়া দলিলটি এই প্রেক্ষিত পরিকল্পনার আওতাধীন নয়, যদিও ১৯৯৬ সালের সরকারী অর্থনৈতিক নীতিমালার সাথে পূর্ববর্তী সরকারের অর্থনৈতিক নীতিমালার তেমন কোন পার্থক্য নেই। বাংলাদেশ সরকার ইত:পূর্বে ১৯৭৮ সালে এবং ১৯৮৩ সালে প্রেক্ষিত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার রূপরেখা প্রণয়ন করেছিল কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এই রূপরেখা এবং পরবর্তী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দলিলের মধ্যে তেমন সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়নি।

বর্তমান বিশ্বের দ্রুত পরিবর্তনশীল অবস্থায় প্রেক্ষিত পরিকল্পনার কার্যকারিতা অনেকাংশেই হ্রাস পাচ্ছে। নিম্নে উপর্যুক্ত তিন ধরনের পরিকল্পনা দলিলের পারস্পরিক সম্পর্ক সময়ের ভিত্তিতে তুলে ধরা হ'ল ঃ

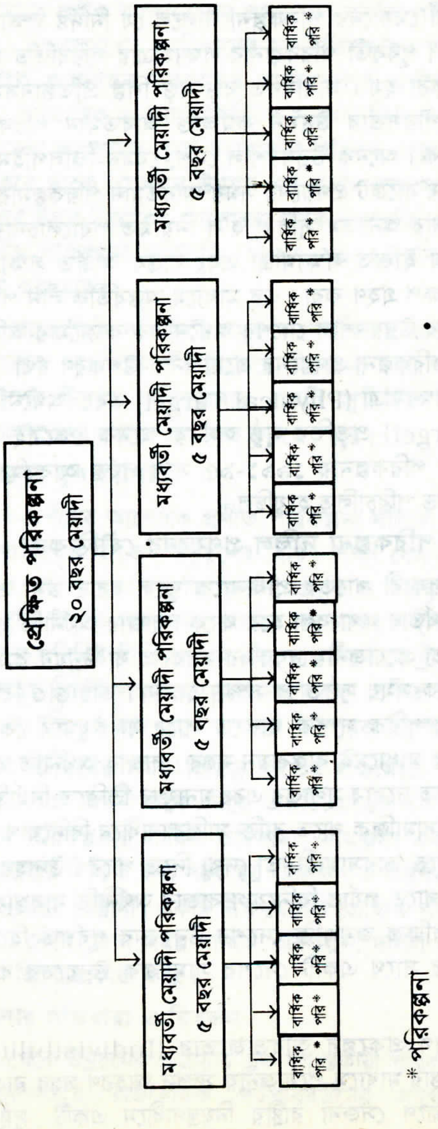

আবর্তমান পরিকল্পনা (Rolling Plan)

এটা সত্যি যে, পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় ভৌত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে অনুমিত ধারণার ব্যত্যয় ঘটতে পারে; সেক্ষেত্রে অন্তর্বর্তীকালীন পরিকল্পনা দলিলের সংশোধন প্রয়োজন হয়। পরিকল্পনার ধারা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে সেজন্য কোন কোন সময় আবর্তমান পরিকল্পনা (Rolling Plan) প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। আবর্তমান পরিকল্পনায় মধ্যবর্তী মেয়াদের পরিকল্পনা দলিলে যে নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা থাকে তা পুনর্বিন্যাস করা হয়। পূর্ববর্তী পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রার পরিবর্তিত অবস্থার নিরিখে সম্পদের প্রাক্কলন করা হয়। সাধারণত বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং পৌর করপোরেশন বা পৌরসভার উন্নয়ন কর্মকান্ড আবর্তমান পরিকল্পনার অধীনে পরিচালিত হয়ে থাকে। অনেক উন্নয়নশীল দেশ, যেমন-ফিলিপাইন, পোর্টোরিকো প্রভৃতি দেশের জাতীয় বাজেট প্রণয়নের সময় আবর্তমান পরিকল্পনার ধারণা প্রাধান্য পায়। এই পরিকল্পনার অন্যতম সুবিধা হ'ল নিয়মিত পর্যালোচনার এবং যথাযথ পরিমার্জনের মাধ্যমে ইপ্সিত লক্ষ্যমাত্রা এবং বাস্তব অর্জিত লক্ষ্যমাত্রার পার্থক্য নিরসনে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এর মাধ্যমে অন্তর্বর্তীকালীন পরিকল্পনার ধারা অব্যাহত থাকে। তবে উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর অস্থিতিস্থাপকতার অভাবে আবর্তমান পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রয়োজনীয় উপকরণ যথা- দক্ষ জনশক্তি, পরিকল্পনার ভৌত লক্ষ্যমাত্রা (Physical Target) এবং অর্থনৈতিক লক্ষ্যমাত্রা (Financial Target) প্রভৃতির সুষ্ঠু সমন্বয় অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনায় ১৯৯১-৯৫ সাল পর্যন্ত আবর্তমান পরিকল্পনার অধীনে উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালিত হয়েছিল।

উন্নয়নশীল দেশে পরিকল্পনা দলিল প্রণয়নের যৌক্তিকতা

উন্নয়ন কর্মকান্ডে সরকারী খাতের প্রাধান্যকে তুলে ধরার জন্য প্রায়শই বাজার অর্থনীতি ব্যবস্থার ব্যর্থতার কথা বলা হয়ে থাকে। বাজার অর্থনীতি ব্যবস্থায় আয়ের সুষম বন্টন এবং নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ যা উন্নয়ন কর্মকান্ডের একটি প্রধান শর্ত, তা অনেক সময় সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় না। তাছাড়াও বিভিন্ন বিনিয়োগ সিদ্ধান্তের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক থাকতে পারে যা শুধুমাত্র কেন্দ্রীভূত একটি বিনিয়োগ পরিকল্পনার মাধ্যমেই বাস্তবায়ন সম্ভব। বাজার অর্থনীতি ব্যবস্থায় বিভিন্ন খাতের বিনিয়োগ মূলত দ্রব্যের মূল্যস্তর এবং মুনাফার ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়ে থাকে সেজন্যে কোন কোন সামাজিক খাতে ব্যক্তি মালিকানাধীনে বিনিয়োগ পর্যাপ্ত না হলে সার্বিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে ভারসাম্যহীনতা দেখা দিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, স্বাস্থ্য এবং প্রাথমিক শিক্ষা খাতে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ বাজার অর্থনীতি ব্যবস্থার অধীনে সম্ভব নয়। কিন্তু একটি শিক্ষিত জনশক্তি দেশের উন্নয়নের পূর্বশর্ত হিসেবে স্বীকৃত। শিক্ষিতের হার বৃদ্ধির সাথে একটি দেশের সামাজিক উন্নয়নের ধনাত্মক সম্পর্ক রয়েছে।

কোন কোন বিনিয়োগ প্রকল্পের অবিভাজ্যতার (Indivisibilities) কারণে বাজার অর্থনীতি ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সম্পদ আহরণ সম্ভব নাও হতে পারে। ভৌত কাঠামো নির্মাণে সেজন্য রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে একটি সুষ্ঠু বিনিয়োগ

পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়। উদাহরণ হিসেবে যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের কথা উল্লেখ করা যায়। একটি সমন্বিত দাতা সংস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে ব্যয়বহুল এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। তাছাড়া বাজার অর্থনীতি ব্যবস্থায় অনেক সময়ই সমন্বিত নীতিমালার অভাব পরিলক্ষিত হয়।

কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে পরিকল্পনা প্রণয়নের একটি মনস্তাত্তিক দিকও থাকতে পারে। ১৯৭৩ সালে প্রণীত বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা দলিলটি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বাংলাদেশের সংবিধানের মুলনীতিসমূহের আলোকে প্রণীত এই পরিকল্পনা দলিলে তদানীন্তন সরকারের স্বাধীনতাপূর্ব অর্থনৈতিক মেনিফেষ্টোর প্রতিফলন ছিল। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত সরকার নির্বাচন পূর্ববর্তী অর্থনৈতিক প্রতিশ্রুতির রূপরেখা জনসমক্ষে তুলে ধরার জন্য বিধিবদ্ধ মেয়াদের জন্য পরিকল্পনা দলিল প্রণয়ন করে থাকে, যেখানে উন্নয়ন-এর প্রধান লক্ষ্যসমূহ এবং সরকারের গৃহীত নীতিমালার উপর বিস্তারিত আলোচনা থাকে। সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকারের খস্ড়া পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দলিলটি (১৯৯৭-২০০২) একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

দ্বিপাক্ষিক এবং বহুজাতিক দাতাসংস্থাসমূহ অনেক সময় প্রকল্পভিত্তিক অর্থায়নে পরিকল্পনা প্রণয়নকে আবশ্যিক শর্ত হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন। উন্নয়নশীল দেশসমূহও তাদের উন্নয়ন পরিকল্পনার একটি সুনির্দিষ্ট রূপরেখার মাধ্যমে দাতাসংস্থাসমূহকে সাহায্য প্রদানে প্রভাবিত করতে পারে।

পরিকল্পনা দলিলের মুল বৈশিষ্ট্য

রাজনৈতিক নীতি-দর্শনের আলোকে প্রণীত পরিকল্পনা দলিলে সরকারের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের উদ্দেশ্য বিধৃত থাকে। উন্নয়নের বিবিধ লক্ষ্য যেমন, দারিদ্র বিমোচন, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, প্রসূতি ও শিশুমৃত্যুর হারহ্রাসকরণ, শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি প্রভৃতি লক্ষ্যসমূহ অর্জনে সরকারের গৃহীত কর্মসূচি এবং সে কর্মসূচি বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এই নীতিসমূহ নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে প্রণীত হয় এবং নীতিসমূহ পারস্পরিকভাবে সংগতিপূর্ণ এবং একে অপরের পরিপুরক হিসেবে কাজ করে।

পরিকল্পনা দলিল প্রণয়নের সময় বিভিন্ন খাতের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে সামঞ্জস্য বিধানের লক্ষ্যে সমগ্র অর্থনীতিকে নিয়ে একটি মডেল তৈরি করা হয়। এই মডেলের মাধ্যমে পরিকল্পনায় সার্বিক ভারসাম্য, সামঞ্জস্য এবং সীমিত সম্পদের সর্বাধিক কাম্য ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। সাধারণত অন্তর্বর্তীকালীন পরিকল্পনা দলিল (৪ হতে ৬ বছর মেয়াদী) একটি দীর্ঘ মেয়াদী প্রেক্ষিত পরিকল্পনার আলোকে প্রণয়ন করা হয়। কোন কোন সময় বার্ষিক পরিকল্পনা দলিল অন্তর্বর্তী পরিকল্পনা দলিলের সম্পূরক হিসেবে কাজ করে।

উন্নয়ন পরিকল্পনার গতিধারা ও বিবর্তন

নব্বই এর দশক থেকে উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় এক যুগান্তকারী পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সাথে সাথে কেন্দ্রীয়

নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে সম্পদের বিনিয়োগে সরকারী খাত থেকে বেসরকারী খাতের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে। যদিও নব্বই দশকের এই পরিবর্তন তাৎপর্যপূর্ণ, কিন্তু আশির দশকেই এই পরিবর্তনের সুচনা হয়। ১৯৮২ সালে লিওনিদ ব্রেজনেভ এর মৃত্যুর পর মিখাইল গর্বাচেভ ক্ষমতায় এলে সোভিয়েত অর্থনীতিতে ক্রমাগত পরিবর্তন ঘটতে থাকে। মিখাইল গর্বাচেভ সোভিয়েত ইউনিয়নে ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণের পূর্বে সুপ্রীম সোভিয়েতের একজন সদস্য হিসেবে কৃষিখাতের দায়িত্বে ছিলেন, তখন পর পর ছয় বছর খাদ্য শষ্য উৎপাদনে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি। এই সময় বিকল্প হিসেবে প্রথমে চুক্তিভিত্তিতে ব্যক্তি মালিকানায় চাষাবাদের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু এই উদ্যোগ তেমন সাফল্য লাভ না করলেও সীমিত আকারের পঞ্চাশ বছরের লীজ কর্মসূচি উৎপাদনশীলতায় এক নতুন মাত্রা যোগ করে। মিখাইল গর্বাচেভ'এর দৃষ্টিতে সরকারী খাত একটি ব্যয়বহুল এবং অনুৎপাদনশীল খাত হিসেবে বিবেচিত হয়। সেজন্য তিনি সরকারী খাত সংকোচনের জন্য বেশ কিছু বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ফলে শিল্প প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন উৎপাদনের উপকরণ রাষ্ট্রীয় মালিকানা থেকে ব্যক্তি মালিকানায় স্থানান্তরিত হতে থাকে, যার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ উন্নয়ন পরিকল্পনার অবয়বেও প্রকৃতিগত পরিবর্তন আসতে শুরু করে। পরবর্তীতে গণতন্ত্রায়নের প্রক্রিয়ার ফলে তদানীন্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের কতকগুলি প্রজাতন্ত্র কেন্দ্র হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় প্রশাসনিকভাবে নিয়ন্ত্রিত মূল্য নির্ধারণ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে এবং বিকল্প হিসেবে বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমে মূল্যস্তর নির্ধারিত হয়। প্রশাসনিকভাবে মূল্যস্তর নির্ধারণের সময় চাহিদার সাথে সরবরাহের খুব একটা সংগতি না থাকার কারণে বাজারে পণ্যের দুষ্প্রাপ্যতা দেখা দেয় ফলে মুদ্রাস্ফীতি প্রকট আকার ধারণ করে।

কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা থেকে বাজার অর্থনীতিতে উত্তরণের পথে মূলত তিনটি সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। প্রথমত, মূল্যবোধ এবং আইনগত কাঠামো প্রথমাবস্থায় পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না (Value and Legal system alien to capitalism)। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিকাশে প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং জনসাধারণের ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মানসিক প্রস্তুতিও এর অনুকূলে থাকে না। পূর্বতন আইনগত কাঠামোতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি সংরক্ষণ এবং অর্জনের সুযোগ না থাকায় বাজার অর্থনীতি ব্যবস্থায় উত্তরণের পথে এক মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। দ্বিতীয়ত, উত্তরণের প্রক্রিয়ায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এক অভাবনীয় রূপান্তর সূচিত হয়। বিনিময় ব্যবস্থার পরিবর্তে সরাসরি মূল্য আরোপিত পণ্য দ্রব্যের বিনিময় প্রক্রিয়ায় বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তাছাড়া নিয়ন্ত্রিত আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার পরিবর্তে পণ্য ও সেবার বিনিময়ের জন্য নতুন করে বাজার উদ্ভাবনের প্রয়োজন দেখা দেয়। তদানীন্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের মোট উৎপাদিত পণ্যের শতকরা ৩০-৭০ ভাগ ভোগ ইউনিয়নের প্রজাতন্ত্রসমূহের অভ্যন্তরেই সীমাবদ্ধ ছিল। তৃতীয়ত, কর ব্যবস্থার সুষ্ঠ কাঠামোর অনুপস্থিতির কারণে উত্তরণের প্রক্রিয়ায় সংকট দেখা দিতে পারে। অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে

মুদ্রার কোন ভূমিকা না থাকায় সনাতন ব্যবস্থায় যে সব খাত থেকে রাজস্ব সংগ্রহ করা হত সে সব খাতের বিলুপ্তি ঘটার কারণে প্রাথমিকভাবে মুদ্রা ছাপানোর মাধ্যমে বাজারকে প্রভাবিত করা হয়।

কেন্দ্রীয় পরিকল্পনায় চারটি বিষয়কে গুরুত্ব দেয়া হয়। যথা ঃ প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে সামষ্টিক অর্থনীতির ভারসাম্য, পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সমন্বয়, ব্যক্তিগত সম্পত্তির অনুপস্থিতি এবং বিভিন্ন পণ্য দ্রব্যের মূল্যস্তরের মধ্যে অসামঞ্জস্য। উত্তরণ প্রক্রিয়ায় এই চারটি বিষয়ের পরিবর্তন পরিকল্পনার কাঠামোতেও আমূল পরিবর্তন সুচনা করে। তবে স্বাভাবিক ধারায় উপর্যুক্ত চারটি বৈশিষ্টের পরিবর্তন পরিকল্পনার কাঠামোতে প্রান্তিক প্রভাব ফেলে। চীন এবং ভিয়েতনামের কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার ততটা প্রাধান্য না থাকায় বাজার অর্থনীতি ব্যবস্থায় উত্তরণে তেমন বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়নি।

বেসরকারী মালিকানাধীনে উৎপাদনের উপকরণ হস্তান্তর এবং বাজারের মাধ্যমে মূল্যস্তর নির্ধারণে সরকারের ভূমিকা সার্বিক অর্থনৈতিক বিনিয়োগ গৌণ হয়ে পড়ে এবং সমন্বিত নীতিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে সামষ্টিক অর্থনীতির ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণে সরকার অনুঘটকের ভুমিকা পালন করে। বাজার ব্যবস্থার ত্রুটিসমূহ সংশোধন ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে সরকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রধানত নিম্নোক্ত বিষয়সমুহে পরিকল্পনা প্রণয়নে সরকারের সমন্বিত প্রয়াস প্রয়োজন হয়।

ক) একটি সুষ্ঠ আইনগত কাঠামো যার মাধ্যমে ব্যক্তি মালিকানায় সম্পদ সংগ্রহ ও সংরক্ষণের নিশ্চয়তা থাকে; মুক্ত বাজার অর্থনীতির কাঠামোতে এই নিশ্চয়তা নাগরিক এবং বিদেশীদের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। অধুনা উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পদ সংগ্রহে বৈদেশিক অনুদানের পরিবর্তে সরাসরি বিনিয়োগ (DFI) গুরুত্ব পাচ্ছে। সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রায় পৌছানোর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইনগত এবং ভৌত অবকাঠামো থাকতে হবে। পরিকল্পনায় এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা প্রয়োজন;

খ) বাজার অর্থনীতি ব্যবস্থায় পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার অবয়ব নিশ্চিতকরণ পরিকল্পনার অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই লক্ষ্যে শুল্ক ব্যবস্থার সামঞ্জস্য বিধান এবং উৎপাদনের এককসমূহকে সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদানের নিশ্চয়তা দেয়া;

গ) মুদ্রা এবং রাজস্বনীতি সংহতকরণ, যার মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি এবং বাজেট ঘাটতি সহনীয় পর্যায়ে রাখা যায়;

ঘ) অনিয়ন্ত্রিত বাজার ব্যবস্থায় উন্নয়নের সুফল বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সমভাবে বন্টন বিঘ্নিত হতে পারে। বিশেষ করে, কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচির অধীনে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়নে প্রাথমিকভাবে সমাজের নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাহে সাময়িক সংকট সৃষ্টি করে। কাঠামোগত সমন্বয়ের (Structural Adjustment) সময় বিভিন্ন সমস্যা যেমন, বেকারত্ব, ভর্তুকি প্রত্যাহার করার ফলে কোন কোন পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়। সাময়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর কল্যাণে পরিকল্পনা প্রণয়নে প্রতিকার কর্মসূচি (safety net) থাকা বাঞ্ছনীয়।

গ্রন্থপঞ্জি

1. Parkin. Michael; *Micro Economics,* 2nd edition. Addison Westley. 1993.
2. Melo de Martha. Denizer Cordet & Gelb Alan. *"Pattern of Transition from Plan to Market"*. The World Bank Economic Review. Vol. 10. Sept. 1996. Number-3.
3. United Nations. *Guidelines for Development Planning, Procedure, Methods & Techniques,* New York. 1987.
4. Planning Comission. *Thoughts About Perspective Plan,* Dhaka. Sept. 1983.
5. Planning Commission. *First Five Year Plan,* 1973. Dhaka.

লোক প্রশাসন সাময়িকী
৯ম সংখ্যা, জুন ৯৭, আষাঢ় ১৪০৪

বাংলাদেশের জাতিসত্ত্বার সন্ধান

মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা *

ভূমিকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে,

"আমরা, বাংলাদেশের জনগণ, ১৯৭১ খীষ্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া জাতীয় স্বাধীনতার জন্য ঐতিহাসিক যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করিয়াছি।"

প্রস্তাবনায় আরও বলা হয়েছে, "আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা-যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে।"

সংবিধান দেশের জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন এবং রাষ্ট্রপরিচালনার সর্বোচ্চ আইন। এটি স্বাধীন জাতি হিসেবে বাংলাদেশের মানুষের সামষ্টিক পরিস্থিতির আইনগত ভিত্তি। কিন্তু আইনের পেছনেও রয়েছে ইতিহাস–যে ইতিহাস বাংলাদেশের জনগণকে স্বতন্ত্র জাতিসত্ত্বায় বিকশিত হতে উদ্বুদ্ধ করেছে। আইনগত অর্থে এ জাতির জন্ম ১৯৭১ সনে হলেও বাংলাদেশের জাতিসত্তার মূল অনেক গভীরে প্রোথিত। বলা যায়, স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশের মাধ্যমে আমাদের জাতিসত্ত্বা পরিণতি লাভ করেছে।

জাতিসত্ত্বার ধারণা

বাংলা ভাষায় 'জাতি' শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। বক্ষ্যমাণ আলোচনায় এটি ইংরেজী 'Nation' শব্দটির সমার্থক। অপরদিকে 'সত্ত্বা' মানে বলা হয় অস্তিত্ব, বিদ্যমানতা, নিত্যতা ইত্যাদি। সুতরাং 'জাতিসত্ত্বা' শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় 'nation বা জাতি হিসেবে অস্তিত্ব। জাতি হিসেবে বাংলাদেশের মানুষের অস্তিত্ত্বের উৎস অনুসন্ধানই এ আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য।

জাতি হিসেবে আমাদের সত্ত্বা, কিংবা সাধারণভাবে মানুষের জাতিগত বিন্যাস অনেক পুরনো হলেও জাতি, জাতিসত্ত্বা, জাতীয়তা, জাতীয়তাবোধ, জাতীয়তাবাদ প্রভৃতি ধারণা অবশ্যই বর্তমান যুগের। প্রকৃতপক্ষে আধুনিক ইউরোপে প্রথম এ ধারণা বিকশিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর স্বকীয়তাবোধ

---

* অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ

জোরদার হয়। সেই সঙ্গে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে ক্রমান্বয়ে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান হতে থাকে। এ সময় নব্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলোর জনসাধারণের মধ্যে সুগভীর জাতীয়তাবোধ লক্ষ্য করা যায়। এ সকল দেশের মুক্তিসংগ্রামে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছেন, তাঁদের অধিকাংশই জাতীয়তাবাদী নেতা হিসেবে পরিচিত হন। প্রকৃতপক্ষে জাতিগত চেতনা এসব দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে।

জাতিসত্ত্বা, জাতীয়তাবোধ, জাতীয়তাবাদ এগুলো মূলত মরমী প্রপঞ্চ। এর সঙ্গে মানুষের অনুভূতির প্রশ্ন জড়িত থাকে। মানুষের পরিচিতির বিভিন্ন মাত্রা (dimension) থাকে; এটি ব্যক্তির বেলায় যেমন প্রযোজ্য, তেমনি প্রযোজ্য সমষ্টির ক্ষেত্রে। জাতিগত পরিচয়ের ক্ষেত্রেও এ বহুমাত্রিকতার প্রশ্নটি পরিহার করা দুষ্কর। এ প্রসঙ্গে খুশবন্ত সিং-এর খ্যাতনামা রচনা Why I Am An Indian থেকে উদ্বৃতি দেয়া যেতে পারে।

" Are you an Indian first and a Punjabi or Sikh Second? Or is it the other way round? I don't like the way these questions are framed and if I am denied my Punjabiness or my community tradition, I would refuse to call myself Indian. I am Indian, Punjabi and Sikh."

এ বহুমাত্রিকতা সত্ত্বেও জাতিগত পরিচিতির একটি মৌলিক উপাদান থাকে, যা একটি জনগোষ্ঠিকে এক সূত্রে গ্রথিত করে। সে মৌলিক উপাদান হতেই সৃষ্ট হয় জাতীয় চেতনা ও জাতীয়তাবোধ–যা দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের মূল প্রেরণা। এ মৌলিক উপাদানও বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে ভিন্ন হতে পারে; কিন্তু এর সূদূরপ্রসারী প্রভাবকে অস্বীকার করার উপায় নেই।

Hans Kohn তাঁর Nationalism: Its meaning and History গ্রন্থে লিখেছেন, বর্তমান যুগে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে nation-state এর ভিত্তিতে যে জাতিসত্ত্বা গড়ে উঠেছে, সেখানে আনুগত্যের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ আনুগত্য অবশ্যই স্বতস্ফুর্ত এবং অনেকগুলো ব্যাষ্টিক অনুভূতি ও আনুগত্যের সমন্বয়েই গড়ে ওঠে একটি জাতিগত পরিচিতি।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে জাতিসত্ত্বার বিভিন্ন উপাদান লক্ষ্য করা যায়। যেমন, নৃতাত্ত্বিক, ভাষাতাত্ত্বিক, ভৌগোলিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক প্রভৃতি। একটি দেশের সকল মানুষের মধ্যে এ সবগুলো উপাদান বিদ্যমান থাকবে, এটি অকল্পনীয়। প্রকৃতপক্ষে এগুলোর মধ্যে এক বা একাধিক উপাদানের অভিন্নতা কিংবা প্রাধান্য একটি জাতির বিকাশে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট

উপর্যুক্ত উপাদানসমূহের আলোকে যদি বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করা যায়, তাহলে দেখা যাবে, স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ক্ষেত্রে ভাষাতাত্ত্বিক উপাদানই বেশী কাজ করেছে। তার আগে ১৯৪৭ সনে ভারত-বিভাগ

তথা পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পেছনে সক্রিয় ছিল ধর্মীয় অনুভূতি। তারও আগে অবিভক্ত ভারতে জাতিসত্ত্বা বিকাশের পশ্চাতে ভাষাগত কিংবা ধর্মীয় চেতনা কোনটিই মৌলিক উপাদান ছিল না। ভারতে আগেও অনেক ভাষা ও ধর্মের লোক বসবাস করেছে এবং এখনো করছে।

জাতি হিসেবে বাঙ্গালীর ইতিহাস অনেক পুরনো। বাংলা ভাষার ইতিহাসও অনেক দিনের। কিন্তু স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় একটি সাম্প্রতিক ঘটনা। এ অভ্যুদয়ের ক্ষেত্রে ভাষাগত চেতনা প্রধান প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। এ প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়েই এদেশের মানুষ সচেতন হয়েছে নিজস্ব ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে। ভাবতে প্রণোদিত হয়েছে জাতিসত্ত্বার অন্যান্য উপাদান সম্পর্কে।

প্রাচীন বাংলার মানচিত্র

বর্তমানে যারা বাংলাদেশের অধিবাসী বলে পরিচিত, তারা সবাই অভিন্ন নরগোষ্ঠীর লোক নয়, একথা প্রায় সর্বজনবিদিত। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর সংমিশ্রণে এ জাতি গঠিত হয়েছে। দূর অতীতে এ জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই ছিল কোমবদ্ধ এবং শত শত বছর যাবৎ তারা কোম জীবনেই অভ্যস্ত ছিল। প্রতিটি কোম আলাদা আলাদা জায়গা নিয়ে মোটামুটি স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবন যাপন করত, অন্যান্য কোমের সঙ্গে যোগাযোগ বড় একটা ছিল না। এ পর্যায়ে বৃহত্তর জনচেতনা ও সমাজ কাঠামো গড়ে ওঠার সুযোগ ছিল সীমিত। পরবর্তীকালে বিভিন্ন প্রকার রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের ফলে বিভিন্ন কোমের মধ্যে যোগাযোগ, সংঘাত ও আদান-প্রদান শুরু হয় এবং কালক্রমে বৃহত্তর অঞ্চলগুলোকে ভিত্তি করে বিভিন্ন কোমের উৎপত্তি ঘটে। বঙ্গ, পুণ্ড্র,, রাঢ়, গৌড় প্রভৃতি জনপদের উৎপত্তি এই প্রক্রিয়ারই ফল।

বঙ্গ খুব প্রাচীন দেশ। মহাভারতেও বঙ্গের উল্লেখ রয়েছে। প্রাচীন পুঁথিতে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায়। অঙ্গ বলতে সাধারণভাবে বর্তমান বিহার এবং কলিঙ্গ বলতে বর্তমান উড়িষ্যাকে বোঝাত। বঙ্গ ছাড়াও সে যুগে এ অঞ্চলে যে সকল জনপদের অস্তিত্ব ছিল, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে পুণ্ড্র, রাঢ়, সুহম, সমতট ও হরিকেল। মোটামুটিভাবে বর্তমান ঢাকা বিভাগ ও বৃহত্তর বরিশাল (তৎকালীন নাম চন্দ্রদ্বীপ) অধিকাংশ সময়ে বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ জনপদের সীমা কখনও কখনও পূর্বে ও পশ্চিমে আরও বিস্তৃত হয়েছে। মোটামুটিভাবে বর্তমান রাজশাহী বিভাগ তথা উত্তর বঙ্গ নিয়ে তৎকালীন পুন্দ্র জনপদ গঠিত ছিল। গুপ্ত যুগে এটি পুণ্ড্রবর্ধন নামে গুপ্ত সাম্রাজ্যের একটি ভুক্তিতে পরিণত হয়। তদানীন্তন পুন্দ্রের রাজধানী ছিল বর্তমান বগুড়া জেলার মহাস্থান। পুণ্ড্রবর্ধনের মূল ভূখন্ড এক সময়ে 'বরেন্দ্র' নামে অভিহিত ছিল।

বৃহৎসংহতি ও পুরনো পুঁথিপত্রে 'উপবঙ্গ' নামে একটি জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায়। এক সময় উপবঙ্গ বলতে বর্তমান বৃহত্তর যশোর জেলা ও তার আশে পাশের এলাকাকে বোঝানো হত। 'প্রবঙ্গ' নামে একটি জনপদেরও অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু এর সঠিক অবস্থান জানা যায় না। একাদশ শতকের শেষদিকে 'উত্তর বঙ্গ' ও 'অনুত্তর বঙ্গ' নামে বঙ্গের দু'টি ভাগ কল্পিত হয়েছিল। পদ্মা ছিল এই দু'টি ভাগের সীমানা।

পুরানো পুঁথিপত্রে 'সমতট' নামের একটি জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায়। সমতট ছিল কামরূপের দক্ষিণে। বর্তমান আসাম ও মেঘালয় রাজ্যের প্রাচীন নাম কামরূপ। বর্তমান বৃহত্তর কুমিল্লা ও নোয়াখালি জেলা এবং ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য সমতটের অংশ ছিল। সমতটের দক্ষিণে ছিল হরিকেল। প্রাচীন পুঁথি অনুযায়ী এ জনপদটি ছিল চন্দ্রদ্বীপ সংলগ্ন। সে থেকে ধারণা করা যায়, বর্তমান বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা ছিল হরিকেলের অংশ।

মোটামুটিভাবে ভারতের পশ্চিম বঙ্গ রাজ্যের দক্ষিণাঞ্চল নিয়ে গঠিত হয়েছিল প্রাচীন রাঢ় জনপদ। এ জনপদের উত্তরাংশ বজ্রভূমি ও দক্ষিণাঞ্চল সুহমভূমি নামে পরিচিত ছিল। বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমা, সাঁওতালভূমিসহ সমগ্র বীরভূম জেলা এবং বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমা নিয়ে গঠিত ছিল উত্তর রাঢ়। বর্ধমান জেলার দক্ষিণাংশ, হুগলি জেলার বহুলাংশ এবং হাওড়া জেলা নিয়ে গঠিত হয়েছিল দক্ষিণ রাঢ়। মহাভারতে, জাতকের গল্পে, বৌদ্ধ পুঁথিতে ও বিদেশী পর্যটকদের বর্ণনায় তাম্রলিপ্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। সুহমভূমিতেই অবস্থিত ছিল বিখ্যাত তাম্রলিপ্তি বন্দর।

কোটিল্যের অর্থ-শাস্ত্রে, বাৎস্যায়নের রচনায় ও অন্যান্য গ্রন্থে গৌড়ের সমৃদ্ধির উল্লেখ পাওয়া যায়। মোটামুটিভাবে বর্তমান মুর্শিদাবাদ-বীরভূমই ছিল প্রাচীন গৌড়ের মূল ভূখন্ড। গৌড়ের আধিপত্য কখনও কখনও পার্শ্ববর্তী জনপদসমূহ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে।

পুণ্ড্র এবং গৌড়ের অধীনে সমগ্র বাংলাকে একত্র করার প্রয়াস সফল হয়নি। যে বঙ্গ ছিল আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির চোখে ঘৃণা ও অবজ্ঞার বিষয়, অবশেষে সে 'বঙ্গ' নামেই বাংলার সকল জনপদ ঐক্যবদ্ধ হল পাঠান আমলে। চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ নিজেকে 'শাহ-ই-বাঙ্গালাহ,' হিসেবে ঘোষণা করেন। কিন্তু তাঁর রাজধানী ছিল 'লাখনৌতি' বা 'লক্ষণাবতী' বা গৌড়ে। আবুল ফজল তাঁর 'আইন-ই-আকবর' গ্রন্থে লিখেছেন, 'বঙ্গ' শব্দের সঙ্গে 'আল' যুক্ত হয়ে 'বাঙ্গালা' হয়েছে। 'আল' বলতে শুধু ক্ষেতের আল নয়, ছোট বাঁধও বোঝায়। চাষের জমিতে পানি ধরে রাখার জন্যই আল বা বাঁধের প্রয়োজন হয়। শব্দটিতে বাংলাদেশের কৃষি নির্ভরতা ও নদীমাতৃকতার প্রভাব সুস্পষ্ট। মোগল আমলে এ অঞ্চলকে বলা হত 'সুবা বাঙ্গালাহ'। বস্তুত বঙ্গ থেকেই 'বাঙ্গালা', ফারসি 'বাঙ্গালাহ' পর্তুগিজ 'বেঙ্গালা', ইংরেজী 'বেঙ্গল', এবং আমাদের ভাষায় 'বাংলা'ও 'বাংলাদেশ' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে।

নৃতাত্ত্বিক পরিচয়

বাংলাদেশের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে যে নরগোষ্ঠীর প্রভাব সবচাইতে বেশী, তা হল 'আদি-অষ্ট্রেলীয়' বা 'ভেড্ডিড'। অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের সঙ্গে চেহারার মিল থাকায় এদের বলা হয় 'আদি অষ্ট্রেলীয়'। আর শ্রীলঙ্কার ভেড্ডাদের মত দেখতে বলে এদের নৃতাত্ত্বিক নাম 'ভেড্ডিড'। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল, 'দ্রাবিড়' বা 'আর্য' আসলে নরগোষ্ঠীর নাম নয়, ভাষাগোষ্ঠীর নাম। একই নরগোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠীর ভাষার প্রচলন দেখা যায়। কাজেই ভাষা দিয়ে নরগোষ্ঠীর নাম করলে

বিভ্রান্তি সৃষ্টির অবকাশ থাকে, যদিও নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সঙ্গে ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়।

বাংলাদেশের জনগোষ্ঠির মধ্যে আরেকটি রক্তের ধারা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় এবং তা হচ্ছে মঙ্গোলীয়। বাংলাদেশের মানুষের ওপর যে মঙ্গোলীয় উপগোষ্ঠীর প্রভাব সবচাইতে বেশী, তাদের বলা হয় প্যারোইয়ান। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের মধ্যে মঙ্গোলীয় রক্তধারার মালয়-ইন্দোনেশীয় উপগোষ্ঠীর প্রভাব যথেষ্ট। বিভিন্ন ভূপ্রকৃতি ও জলাবায়ুতে মানুষের বিচিত্র জীবনপ্রবাহ তাদের চেহারায় এমন বৈচিত্র এনেছে যে, কোন্ রক্তধারা কোথায় কতটুকু মিশেছে, তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

খৃষ্টপূর্ব প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে 'ইন্দো-আর্য' নামে পরিচিত ককেশীয় জনগোষ্ঠী উত্তর পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে এ উপমহাদেশে প্রবেশ করে। পরবর্তীকালে এরা উত্তর ভারত থেকে দক্ষিণ ভারত ও পূর্ব ভারতে ছড়িয়ে পড়ে এবং কালক্রমে এখানকার আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে মিশে যায়। 'উচ্চবর্ণের' লোকদের মধ্যে এই নরগোষ্ঠীর চেহারার প্রভাব লক্ষ্যণীয়। তবে, ভেড্ডিশি ও মঙ্গোলীয় রক্তের প্রভাব বাংলাদেশের সামগ্রিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে নেহাত কম।

ইন্দো-আর্যদের আগমনের পর পরই সম্ভবত তুর্কিস্তান এলাকা থেকে শক জাতির লোকেরা ভারতবর্ষে অভিযান চালায়। তারা উপমহাদেশের বিভিন্ন অংশে, বিশেষত দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতে ছড়িয়ে পড়ে এবং কালক্রমে অন্যান্য জাতির সঙ্গে মিশে যায়। নৃতাত্ত্বিকদের মতে, এদেশের 'উচ্চবর্ণে'র লোকদের গোল মাথার মূলে রয়েছে এই শক জাতীয় উপাদান।

বাংলার বাইরের অনেক পরাক্রমশালী রাজা ও সেনাপতি বিভিন্ন সময়ে এদেশ আক্রমণ করেছে। তাদের সঙ্গীদের অনেকে হয়ত এদেশে স্থায়ীভাবে থেকে গেছে এবং কালক্রমে বৃহত্তর জানগোষ্ঠীর সঙ্গে মিশে গেছে। রাজপুত্রদের মধ্যে বিদেশী রাজকন্যা বিয়ে করার প্রচলন ছিল। এক্ষেত্রে বর্ণের বালাই ছিল না। এভাবেও বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর রক্ত এসে মিশেছে। তুর্কি বিজয়ের পরও বাংলাদেশে কিছু ভিন্ন রক্তধারার স্পর্শ লেগেছে। বাংলাদেশে কয়েকজন হাবসি সুলতান রাজত্ব করেছেন। তাছাড়া হাবসি প্রহরী রাখার প্রচলনও এক সময় ছিল। এদের রক্ত মিশেছে এই জাতির মধ্যে। মধ্যযুগে মুসলিম সুফি-সাধকরা এসেছেন সুদূর আরব থেকে। তাঁদের সঙ্গীরাও এসেছেন। দেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে এসেছেন আরবি সওদাগররা। এর ফলে এই জাতির মধ্যে কিছু ভূমধ্যসাগরীয় রক্ত মিশে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। মগ জলদস্যুদের উৎপাতে এক সময় অতিষ্ঠ ছিল বাংলাদেশের উপকূলীয় জীবন। এদের মাধ্যমে কিছু মগ রক্ত সঞ্চারিত হওয়া বিচিত্র কিছু নয়।

বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের দৈহিক কাঠামো বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হয় যে, আদি-অষ্ট্রেলীয় অর্থাৎ ভেড্ডিড বৈশিষ্ট্যই বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর মৌলিক ও প্রধান উপাদান। পরবর্তীকালে বিভিন্ন কারণে ও পরিস্থিতিতে তাতে অল্পবিস্তর মঙ্গোলীয়, ইন্দো-আর্য ও শক-পামিরীয় উপাদান এসে মিশেছে। সাধারণভাবে বাংলার পশ্চিমাঞ্চলে ইন্দো-আর্য ও শক। পামিরীয় উপাদান এবং পূর্বাঞ্চলে মঙ্গোলীয়

প্যারোইয়ান ও মালয়-ইন্দোনেশীয় প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এ বিচিত্র মেলামেশার ফলে শংকর জাতি হলেও এদেশের মানুষের দেহের একটি নিজস্ব গঠন দাঁড়িয়ে গেছে।

ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

আদি অস্ট্রেলীয় নরগোষ্ঠীর মুল ভাষা ছিল 'অষ্ট্রিক'। স্বাভাবিকভাবে এদেশের আদি অধিবাসীদের ভাষা ছিল অষ্ট্রিক পরিবারভুক্ত। আজও আমাদের ভাষায় 'কুড়', 'পণ', 'গন্ড', 'গুঁড়ি'. 'গুঁটি', প্রভৃতি যেসব শব্দ প্রচলিত হয়েছে সেগুলো অষ্ট্রিক ভাষারই দান। দৈহিক পরিবর্তনের তুলনায় ভাষার পরিবর্তন হয় অনেক দ্রুত। কারণ, ভাষা অনেক বেশী গতিশীল ও প্রবহমান। বিজয়ী সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিজিত সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে অনেকাংশে বদলে দেয়। সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রধান বাহন হচ্ছে ভাষা। কালের বিবর্তনে বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর লোক এদেশে এসেছে। তাদের প্রভাবে এদেশের জনগোষ্ঠীর ভাষা ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়েছে।

যে বৈদেশিক ভাষা প্রবাহ বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতিকে প্লাবিত করেছে, তা হল ইন্দো-আর্য ভাষা। এ ভাষার আদি পরিশীলিত রূপ 'সংস্কৃত'। সাধারণ জনগোষ্ঠীর ব্যবহারে এই ভাষা রূপ নিয়েছে 'প্রাকৃত' বা স্বাভাবিক জনভাষা হিসেবে। এই প্রাকৃত ভাষা উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে। যেমন, শৌরসেনী, মাগ্ধী, অর্ধমাগ্ধী, পৈশাচী। মাগ্ধী-প্রাকৃত থেকেই বর্তমান বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয়েছে বলে অনেক ভাষাবিদ মনে করেন। স্বাভাবিকভাবেই এ ভাষায় গৃহীত হয়েছে আদি অষ্ট্রিক ভাষার অনেক শব্দ। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, আর্যভাষী লোকেরা ভারতে আধিপত্য বিস্তারের সময় এখানকার আদিবাসীদের ব্যবহৃত দ্রাবিড় ভাষার অনেক শব্দ আর্য-ভাষায় আয়ত্ত করে নিয়েছিল। আর্য-ভাষার মাধ্যমে এমন অনেক দ্রাবিড় শব্দও বাংলায় এসেছে।

লক্ষ্যণীয় যে, আর্য ভাষীরা বাংলায় খুব একটা বসতি স্থাপন না করলেও তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি এদেশে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এর প্রধান কারণ, সংস্কৃত ছিল রাজভাষা। পরবর্তীকালে মুসলিম আমলেও রাজভাষা ছিল ফারসি। উল্লেখ্য, ফারসিও ইন্দো-আর্য তথা ইন্দো-ইরানীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

উপসংহার

প্রাচীনকালে বিভিন্ন কৌম মিলে যেসব জনপদ গড়ে উঠেছিল, সেগুলো একত্র করার জন্য বিভিন্ন সময় শক্তিশালী শাসকবর্গ চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কৌম সমাজ স্থানীয় জনপদের সত্তাকে বৃহত্তর দেশসত্তায় মিলিয়ে দিতে আগ্রহী ছিল না। এদেশের মানুষের হৃদয়াবেগ, প্রাণধর্ম ও ইন্দ্রিয়ালুতার উৎসও হল সেই আদিম কৌম সমাজ। সাংসারিক জীবন ও পারিবারিক বন্ধনের প্রতি নাড়ির টান, রূপ-রস-গন্ধের প্রতি গভীর আসক্তি, বেদান্তে বিরাগ, শুষ্ক জ্ঞানার্জনের প্রতি অনাগ্রহ এসব এসেছে কৌম সমাজ থেকেই। এই চরিত্র একদিকে যেমন আমাদের শক্তি অন্যদিকে তেমনি দুর্বলতা হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে। শাসকবর্গ আর সাধারণ মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে দুস্তর ব্যবধান। একদিকে সমাজের সাধারণ স্তর হয়েছে একান্তভাবে ভূমি ও

কৃষিনির্ভর, অপরদিকে শাসকবর্গ অভ্যস্ত হয়েছে ভিন্নতর সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রায়। রাষ্ট্রনায়ক ও সমাজপতিদের প্রতি সাধারণ মানুষের আগ্রহ ও আস্থা দেখা গেছে নিতান্তই কম। বৈদেশিক আক্রমণের মুখে শাসকবর্গের নেতৃত্বে জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ খুব কমই ঘটেছে। ফলে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ও ভাষা পরিবারের সভ্যতা ও সংস্কৃতি মিলে একাকার হয়েছে এদেশের আদি অধিবাসীদের জীবনযাত্রার সঙ্গে।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশ, বাংলা ও বাঙালীর উৎস অনুসন্ধান করা হয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের জাতিসত্ত্বা ও রাষ্ট্রসত্ত্বা এক নয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, একই নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী, ভাষা ও সংস্কৃতির মানুষ বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার বাইরেও রয়েছে। এ সব ক্ষেত্রে তারাও অভিন্ন ঐতিহ্যের অংশীদার। কিন্তু যে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটিয়েছে, সেগুলো সময়ের বৃহত্তর পরিসরে সাম্প্রতিক হলেও স্বতন্ত্র জাতিসত্ত্বা বিকাশে অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, স্বায়ত্ত্বশাসনের সংগ্রাম এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ আমাদের দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধকে তীব্রতর করেছে এবং স্বাধীন সত্ত্বার অন্বেষণে আমাদেরকে অনুপ্রণিত করেছে। স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ আমাদের জাতিসত্ত্বার বিকাশে পরিণতি দিয়েছে।

জাতি হিসেবে আমাদের অস্তিত্বের উৎস অনুসন্ধান, জাতিসত্ত্বার লালন ও বিকাশে অবদান রাখবে। এটি একদিকে গবেষণার বিষয়, অপরদিকে অনুভূতির। ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতনতা আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে সুসংহত করতে সহায়ক হবে। এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, জাতীয় সংস্কৃতি (national culture) হচ্ছে মুল স্রোতধারা (dominant culture) এবং অপরাপর সংস্কৃতি (sub-culture) এর সমষ্টি। পূর্বোক্ত রচনায় খুশবন্ত সিং বলেছেন "I am convinced that our guaranteed diversity is our strength as a nation." বাংলাদেশের জনগোষ্ঠী ও সংস্কৃতি ভারতের মত এত বৈচিত্র্যপূর্ণ নয়। তা সত্ত্বেও আমাদের মধ্যে যে সীমিত বৈচিত্র রয়েছে, তাকেও বৃহত্তর অর্থে বাংলাদেশের জাতিসত্ত্বার অংশ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। সাম্য, স্বাধীনতা, সুবিচার, কল্যাণ ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ হবে আমাদের জাতিসত্ত্বার লালন ও বিকাশের উজ্জীবনী শক্তি।

লোক প্রশাসন সাময়িকী
৯ম সংখ্যা, জুন ৯৭, আষাঢ় ১৪০৪

মধ্যযুগে বাংলাদেশের আর্থ-প্রশাসনিক অবস্থা

আ, ক, ম, মাহবুবুজ্জামান *

ভূমিকা

বাংলাদেশের শাসনতান্ত্রিক যুগ পরিক্রমায় ঐতিহাসিকবৃন্দ ১২০১ সাল থেকে ১৭৫৭ সাল পর্যন্ত সময়কে 'মধ্যযুগ' বলে অভিহিত করেন। মধ্যযুগের আরম্ভ হয় ইখতিয়ার-উদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক বাংলা বিজয়ের মধ্য দিয়ে, যা ১২০১ বা ১২০৪ সালে সংঘটিত হয়েছিল। আর এ যুগের সমাপ্তি ঘটে নবাব সিরাজউদ্দৌলার বৃটিশের নিকট ১৭৫৭ সালে পলাশী প্রান্তরে পরাজয়ের মাধ্যমে। মধ্যযুগের প্রায় সাড়ে পাঁচশ' বছর এদেশে প্রধানত মুসলিম শাসকবৃন্দ শাসনকার্য পরিচালনা করেছিলেন। যার মধ্যে মাত্র পাঁচ বছরের জন্য ব্যতিক্রম ঘটিয়ে রাজা গণেশ নামক হিন্দু নৃপতি ও তাঁর বংশধর (১৪১৪-১৪১৯ সাল) এদেশে রাজত্ব করেন। কতিপয় হিন্দু সামন্ত ও জমিদার বিচ্ছিন্ন ও আঞ্চলিকভাবে কখনও কখনও শাসন পরিচালনা করে থাকলেও কেন্দ্রীয়ভাবে তাঁরা শাসনক্ষমতা লাভ করেননি।

মধ্যযুগে বাংলাদেশের সীমানা বর্তমান বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের মধ্যে (যাকে অবিভক্ত বাংলা বলা হতো) সীমাবদ্ধ ছিলনা। বিভিন্ন সময়ে এই রাজ্যের সীমা বিভিন্ন অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ও সংকুচিত হয়েছে। বিস্তৃত সীমারেখার মধ্যে বর্তমান ভারতের বিহার, উড়িষ্যা, ত্রিপুরা, আসাম ও বার্মার আরাকান রাজ্য অথবা এসব এলাকার অংশ বিশেষ বাংলা রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

মধ্যযুগে বাংলাদেশের রাজধানী ও শাসন প্রণালী বহুবার পরিবর্তিত হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে এই অঞ্চলটি স্বাধীনভাবে শাসিত হয়েছে এবং বিভিন্ন সময়ে দিল্লীর শাসনকর্তাদের অধীনে ও তাদের নিযুক্ত বা মনোনীত ব্যক্তি দ্বারা শাসিত হয়েছে।

এই প্রবন্ধে প্রধানত মধ্যযুগে এ দেশের প্রশাসন ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

শাসনব্যবস্থা অনুসারে মধ্যযুগের বিভাজন

শাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান পরিবর্তন অনুসারে ঐতিহাসিকগণ মধ্যযুগকে চারটি ভাগে বিভক্ত করেছেন, যা সময়ের বিভাজনের সঙ্গেই মূলত সম্পৃক্ত। নিচে চারটি ভাগের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা তুলে ধরা হলো ঃ

ক) মধ্যযুগের প্রথম ভাগ (১২০১-১৩৩৮ সাল)

বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক বাংলার হিন্দু রাজা লক্ষণসেনকে পরাজিত করে (১২০১

* ঊর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

সাল, মতান্তরে ১২০৪ সাল) মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠা থেকে আরম্ভ করে তাঁর বংশধরবৃন্দসহ উল্লেখযোগ্য অন্যান্য মুসলিম শাসক, যেমনঃ আলী মর্দান, নাসির উদ্দিন মাহমুদ, তাতার খান, শেরখান, আমীন খান, তুঘরল খান, গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর শাহ, বাহারাম খান প্রমুখ শাসকবৃন্দ এই আমলে বাংলা শাসন করেন। এ সময়ের মধ্যেকার শাসকবৃন্দ প্রধানত দিল্লীর সুলতান ও সম্রাটদের অধীনতা স্বীকার করেই এ দেশ শাসন করেছেন। মাঝে মাঝে দু'চারজন নৃপতি দিল্লীর বশ্যতা অস্বীকার করলেও বেশীরভাগ সময় বাংলাদেশ দিল্লীর শাসনের অধীনেই শাসিত হয়েছে।

খ) মধ্য যুগের দ্বিতীয়ভাগ (১৩৩৮-১৫৭৬ সাল)

১৩৩৮ সালে ফখরুদ্দীন সোনারগাঁ অধিকার করে নিজেকে স্বাধীন সুলতান বলে ঘোষণা দেন। দিল্লীর বশ্যতা অস্বীকার করে স্বাধীন সুলতানী আমল তখন থেকেই এদেশে আরম্ভ হয় এবং দু'শ' বছরেরও অধিককাল এরূপ স্বাধীন সুলতানী আমল বলবৎ থাকে। ১৫৭৬ সালে স্বাধীন সুলতান দাউদ খান কররানীকে পরাজিত করে সম্রাট আকবর বাংলাদেশে পূর্ণরূপে মোগল শাসন কায়েম করেন। তখন থেকে এই দেশটি আবার দিল্লীর শাসনের অধীনে পরিচালিত হতে থাকে। স্বাধীন সুলতানী আমলে ইলিয়াস শাহী বংশ, মাহমুদ শাহী বংশ, হাবশী বংশ ও হোসেন শাহী বংশের শাসনকাল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

গ) মধ্যযুগের তৃতীয়ভাগ (১৫৭৬-১৭১৭ সাল)

মধ্যযুগের তৃতীয়ভাগের প্রায় সম্পূর্ণ সময় ধরে এদেশে মোগল শাসন কায়েম ছিল। মোগল সম্রাটদের নিকট বাংলা একটি প্রদেশ হিসেবে গণ্য হতো এবং একজন সুবাদারের (গভর্ণর) মাধ্যমে এদেশে শাসন কার্য পরিচালনা করা হতো। বাংলার সুবাদারদের মধ্যে প্রধানত খান-ই-আজম, ওয়াজিদ খান, রাজা মানসিংহ, শের আফগান, ইসলাম খান, শায়েস্তা খান ও আজিমুস-সান উল্লেখযোগ্য ছিলেন।

ঘ) মধ্যযুগের চতুর্থ ভাগ (১৭১৭-১৭৫৭ সাল)

১৭১০ সালে বাংলার দেওয়ান ও নায়েব সুবাদার (কার্যত সুবাদার) নিযুক্ত হন মুর্শিদকুলী খান। তিনি বাংলার রাজধানী মখ্‌সুদাবাদে স্থানান্তরিত করে নিজের নামানুসারে তার নাম দেন মুর্শিদাবাদ। তিনি অসীম ক্ষমতা ভোগ করতেন এবং ১৭১৭ সালে নিজেকে 'নবাব' বলে পরিচিত করেন। দিল্লীর শাসন ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ায় নামমাত্র দিল্লীর অধীনতা এদেশে কার্যকর ছিল এবং রাজতন্ত্র কায়েম করে সকল নৃপতিই নিজেদেরকে স্বাধীন নবাব বলে ঘোষণা করেন। এ আমলের নৃপতিদের মধ্যে মুর্শিদকুলী খান, শুজাউদ্দিন মুহম্মদ খান, সরফরাজ খান, আলীবর্দী খান ও সিরাজউদ্দৌলা উল্লেখযোগ্য। নবাব সিরাজউদ্দৌলা ১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে বৃটিশ বাহিনীর নিকট পরাজিত হলে এদেশে প্রকারান্তরে বৃটিশ রাজত্ব কায়েম হয় এবং প্রশাসনিকভাবে মধ্যযুগের অবসান ঘটে।

প্রশাসনিক অবস্থা

ক) মধ্যযুগের প্রথম ভাগের প্রশাসনিক অবস্থা

ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজী ১২০৪ সালে বাংলাদেশে প্রথম মুসলিম রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন এবং রাজ্যের নামকরণ করেন 'লখনৌতি' বলে। তাঁর

অধিকারভুক্ত রাজ্যকে কতগুলো প্রশাসনিক অঞ্চলে ভাগ করেন। প্রশাসনিক অঞ্চলগুলোকে 'ইক্তা' বলা হতো এবং সেগুলোর শাসনকর্তাদেরকে 'আমীর বা মোক্তা' নামে অভিহিত করা হতো। আমীর বা মোক্তাগণ প্রশাসনিক, রাজস্ব আদায় ও বিচার বিষয়ক দায়িত্ব পালন করতেন। ১২২৭ সাল পর্যন্ত এই রাজ্য দিল্লীর সুলতানের নামমাত্র অধীনতা স্বীকার করেছিল। ১২২৭ সাল থেকে ১২৮৫ সাল পর্যন্ত বেশীরভাগ সময় এই রাজ্যটি দিল্লীর সুলতানের অধীনে একটি মাত্র 'ইক্তা' হিসেবে পরিগণিত হয়।

১২৮৫ সালে তৎকালীন শাসনকর্তা বুঘরা খান দিল্লীর সুলতানের অধীনতা অস্বীকার করেন এবং ১৩২২ সাল পর্যন্ত এই রাজ্যের স্বাধীনতা বলবৎ থাকে। সে সময়ে আবারও অনেকগুলো 'ইক্তা'য় দেশটিকে ভাঁগ করা হয়। বর্তমান বাংলাদেশের যতটুকু এলাকা তখন ঐ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল সে টুকুকে 'অর্‌সহ্ বঙ্গালহ্' নামক ইক্তা হিসেবে গণ্য করা হতো। ১৩২২ সালে দিল্লীর সুলতান মুহম্মদ তুগলক বাংলাদেশ অধিকার করে একে তিনটি ইক্তায় বিভক্ত করেন। ইক্তা তিনটির নামকরণ করা হয় লখনৌতি, সাতগাঁও ও সোনারগাঁও নামে। ঐ সময়ে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বিন্যাস ও অগ্রগতি তেমন একটা সাধিত হয়নি।

খ) মধ্যযুগের দ্বিতীয়ভাগের প্রশাসনিক অবস্থা

১৩৩৮ সালে বাংলাদেশের শাসনকর্তা আবার দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করেন এবং রাজ্যটির নাম 'বঙ্গালহ্' নির্ধারণ করেন। ১৫৩৮ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ প্রধানত স্বাধীন শাসকবর্গ দ্বারা শাসিত হয়। এসব শাসকবৃন্দ নিজেদেরকে 'সুলতান' হিসেবে পরিচিত করেন। সুলতানগণ দিল্লীর সুলতানদের মত রাজ্য শাসন প্রণালী এবং উপাধি প্রদানের বন্দোবস্ত করেন। এই সময়ের বর্ণনা প্রধানত পাওয়া যায় 'শিং-ছা-শ্যং-লান' নামক চৈনিক বিবরণী থেকে এবং কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনীতে। সুলতানদের শাসনামলের বর্ণনা এখানে দেয়া হলো।

প্রশাসনিক উপাধি

সুলতানগণ তাঁদের বিশ্বাসভাজন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিভাবান্বিত ব্যক্তি, রাজ্যের অভিজাত ও ধনিক সম্প্রদায়, আত্মীয় -স্বজন এবং দক্ষ সেনাপতিদের সমন্বয়ে একটি পরিষদ গড়ে তুলতেন। রাজ্য পরিচালনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই পরিষদের সদস্যদের মতামত গ্রহণ করা হতো। সুলতানের মৃত্যুর পর সিংহাসনের অধিকারী নির্বাচনে এই পরিষদের বিশেষ ভূমিকা ছিল। পরিষদের বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিভিন্ন উপাধি প্রদান করা হতো। এসব উপাধির মধ্যে খান মজলিস, মজলিসুল আলা, মজলিসে আজম, মজলিসুল মুআজ্জম, মজলিসুল মজালিস, মজলিস বারবক প্রভৃতি উপাধি বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ ছিল। অনেক সদস্যকে 'উজীর' বা মন্ত্রী আখ্যা দেয়া হতো। যুদ্ধকালে যুদ্ধ

ক্ষেত্রে যে উজীরকে নিযুক্ত করা হতো তাঁকে 'লস্কর উজীর' বলা হতো। প্রধান উজীর বা আমীরকে বলা হতো, 'খান-ই-জাহান' অথবা 'আমীর-উল-উমারা'। সুলতানের প্রধান সচিবকে 'দবীর-ই-খাস' এবং অন্যান্য সচিবকে 'দবীর' উপাধি প্রদান করা হতো। সুলতান স্বয়ং রাজ্যের সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন। বিভিন্ন যুদ্ধে তিনি তাঁর মনোনীত ব্যক্তিকে সেনাপতি নিযুক্ত করতেন।

বিচার ব্যবস্থা

সুলতানগণ যুদ্ধ বিগ্রহ কাল বাদ দিয়ে সাধারণ সময়ে প্রায় প্রতিদিন তাঁদের প্রাসাদের বহির্ভাগে নির্মীত মজলিসে উপবিষ্ট হয়ে পারিষদবর্গ নিয়ে প্রজাদের বিভিন্ন অভাব-অভিযোগসহ রাজ্য শাসনের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হতেন। কখনও কখনও বিচারকার্যও পরিচালনা করতেন। তবে স্থানীয় পর্যায়ে বিচারকার্য পরিচালনার জন্য বেশ কিছু বিচারক নিযুক্ত ছিলেন, যাঁদেরকে 'কাজী' বলা হতো। বিভিন্ন অপরাধীকে ধরে এনে বন্দী করে রাখা এবং বিচারের পরে বন্দী অবস্থায় রাখার জন্য 'বন্দী ঘর' ছিল। তবে বিচারের রায়ে সাধারণত বেত্রাঘাত, অর্থ দন্ড ও নির্বাসন দন্ড বেশী দেয়া হতো। রাষ্ট্রদ্রোহীতার শাস্তি বেশীরভাগ ক্ষেত্রে মৃত্যুদন্ড ছিল।

প্রশাসনিক অঞ্চল

স্বাধীন সুলতানী আমলে বাংলাদেশকে কতগুলো প্রদেশে ভাগ করা হয়, যেগুলোকে বলা হতো 'ইকলিম'। ইকলিমের অধীনে এক বা একাধিক বিভাগ ছিল, যেগুলোর নাম ছিল 'অর্‌সহ'। এসব অরসহ কে বাংলা ভাষায় 'মুলুক' বলে অভিহিত করা হয়েছে। এককেটি অর্‌সহ এর অধীনে কতিপয় অঞ্চল বিভক্ত ছিল, যেগুলোকে বলা হতো 'তকসিম'।

রাজস্ব আদায়ের সুবিধার্থে বাংলাদেশকে বহু রাজস্ব অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছিল। প্রতিটি ক্ষুদ্র অঞ্চলকে বলা হতো 'মহল'। কয়েকটি মহল নিয়ে গঠিত হতো একেকটি 'শিক'। মহলের রাজস্ব আদায়কারীকে মহলদার এবং শিকের রাজস্ব আদায়কারীকে শিকদার বলা হতো।

সাধারণত দু'প্রকারের রাজস্ব আদায় করা হতো। যুদ্ধ বিগ্রহের পর বিজিত অঞ্চলের লুণ্ঠিত মালের এক-পঞ্চমাংশ রাজকোষে জমা হতো, বাকী অংশ সৈন্যদেরকে প্রদান করা হতো। রাজকোষে জমাকৃত অংশকে 'গনীমাহ' বলা হতো। অন্য প্রকারের রাজস্বকে বলা হতো 'খরজ' বা 'খাজনা'। খাজনা প্রজাদের উৎপাদিত দ্রব্য, জমি ও অন্যান্য আয়ের উপর ধার্য করা হতো।

অনেক সময় সুলতানগণ কোন বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিকে বার্ষিক রাজস্বের পরিমাণ ধার্য করে দিয়ে একটি 'শিক' বা অঞ্চলের ইজারা প্রদান করতেন। শিকদারগণ নিজেদের মনোনীত মহলদার নিযুক্ত করে প্রজাদের নিকট থেকে খাজনা আদায় করতেন। সুলতানকে নির্ধারিত পরিমাণ রাজস্ব প্রদানের পর যা উদ্বৃত্ত থাকতো তা সেই শিকদার ভোগ করতেন।

ছক : ১

স্বাধীন সুলতানী আমলে রাষ্ট্রের প্রশাসনিক স্তর

বঙ্গাঁলহ
↓
ইকলিম (একাধিক)
↓
অর্‌সহ বা মুলুক (একাধিক)
↓
তকসিম (একাধিক)
↓
শিক (একাধিক)
↓
মহল (একাধিক)

গ) মধ্যযুগের তৃতীয়ভাগের (মোগল আমল) প্রশাসনিক অবস্থা

মধ্যযুগের তৃতীয় ভাগটিকে ১৫৭৬ সাল থেকে মোগল শাসনের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে গণ্য করা হলেও মোগল শাসকবৃন্দ প্রায় ৪০ বছর বাংলাদেশের সম্পূর্ণ এলাকার শাসক ছিলেন না। তাঁরা কেবল পশ্চিম ও উত্তর অংশের শাসক ছিলেন। পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গ তখন বিভিন্ন জমিদার, সামন্ত, ভূঁইয়া ও স্থানীয় রাজা দ্বারা শাসিত হয়েছিল। সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিযুক্ত সুবাদার ইসলাম খান তাঁর কুটনীতি, বিচক্ষণতা ও সমরকৌশল দ্বারা সারা বাংলাদেশকে মোগল শাসনের আওতাভুক্ত করেন। তিনি তাঁর রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তরিত করেন এবং সম্রাট জাহাঙ্গীরের নামানুসারে ঢাকার নাম 'জাহাঙ্গীরনগর' রাখেন। সে আমল থেকে মোগল শাসনের সার্বিক ব্যবস্থাপনা এ দেশে চালু হয়।

১৫৩৮ সালে শেরখান (শের শাহ) বাংলাদেশ জয় করেন এবং মাত্র ৩ মাস পরে সম্রাট হুমায়ুন (মোগল সম্রাট) এ-দেশ দখল করে নেন। এর ১ বছর পরে পুনরায় শের শাহ এদেশ দখল করেন এবং তিনি ও তাঁর বংশধরবৃন্দ প্রায় ১4 বছর এদেশ শাসন করেন। এরপরে কররাণী বংশের রাজত্ব আরম্ভ হয় এবং ১৫৭৬ সালে পুনরায় দেশটি মোগল সাম্রাজ্যের অধীনস্থ হয়।

প্রশাসন

মোগল সম্রাটগণ সুবা বাংলার জন্য একজন সুবাদার নিযুক্ত করে প্রশাসন পরিচালনা করতেন। এছাড়া তাঁরা এদেশে রাজস্ব আদায়ের জন্য একজন দিওয়ান এবং সামরিক ব্যয় নির্বাহের জন্য একজন বখ্‌শী নিযুক্ত করতেন। সম্রাটের আর একজন কর্মকর্তা রাজ্যে (সুবায়) অবস্থান করতেন, যাঁর পদবী ছিল 'ওয়াকিয়ানবিশ' বা 'বকাইনবীশ'। একে গুপ্তচর প্রধান বলা যেতে পারে। ওয়াকিয়ানবীশ রাজ্যের সুবাদারের শাসন ব্যবস্থা, প্রজাদের অবস্থা, ষড়যন্ত্র, সম্রাটের নির্দেশ পালনসহ সম্রাটের নিযুক্ত প্রতিটি

কর্মকর্তা ও সৈন্যের সম্পর্কে গোপনে সম্রাটের নিকট সংবাদ ও প্রতিবেদন প্রেরণ করতেন। ফলে সম্রাট রাজ্য শাসনের সমস্ত খুটিনাটি বিষয়ও অবগত হতে পারতেন। রাজ কর্মচারীদের মধ্যে কিছু কর্মচারীকে সম্রাট মনোনয়ন দিতেন এবং কিছু কর্মচারী সুবাদার কর্তৃক নিযুক্ত হতো। রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সুবাদারকে সম্রাটের মতামত গ্রহণ করতে হতো। সম্রাট কোন সুবাদারের কাজে অসন্তুষ্ট হলে অথবা সুবাদার অত্যধিক স্বাধীনতাশ্রয়ী হয়ে গেলে তার কাজ তদন্ত করার জন্য একজন উচ্চ পদস্ত কর্মকর্তাকে সম্রাটের পক্ষ থেকে রাজ্যে প্রেরণ করা হতো। সুবাদারকে রাজ্যের প্রতিটি কর্মচারীর কার্যক্রম সম্পর্কে রিপোর্ট রাখতে হতো। কর্মচারীদের পদোন্নতি ও পদাবনতি নির্ভর করতো সম্রাটের নির্দেশের উপর।

রাজস্ব ব্যবস্থা

মোগল আমলে ভূমির খাজনাই প্রধানত রাজস্বের উৎস ছিল। ভূমিকে নিম্নোক্ত তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হতোঃ

'খালিসা শরীফা'ঃ যে সমস্ত ভূমি প্রতক্ষ্যভাবে সম্রাটের অধীন ছিল। এরূপ ভূমির খাজনা সরকারী কর্মচারীগণ আদায় করতেন। তবে তাঁরা স্থানীয় ব্যক্তিদের নিকট বছর ভিত্তিক ইজারাদানের মাধ্যমে আদায়ের ব্যবস্থা নিতেন।

'জায়গীর' ঃ রাজ কর্মচারীদেরকে বিশেষ বিশেষ এলাকা জায়গীর হিসেবে প্রদান করা হতো। তাঁরা ঐ এলাকার রাজস্ব আদায় করে তা বেতন হিসেবে ভোগ করতেন।

'অধীনস্থ শাসকের জমি'ঃ এ সমস্ত ভূমির খাজনা থেকে স্থানীয় জমিদার বা রাজাগণ কিছু নির্ধারিত অংশ সম্রাট বরাবরে প্রেরণ করতেন এবং বাকী অংশ নিজেরা ভোগ করতেন। এরূপ খাজনা আদায়ের দায়িত্বও ঐ সব জমিদার বা রাজাদের উপর ন্যস্ত ছিল।

ঘ) মধ্যযুগের চতুর্থভাগের প্রশাসনিক অবস্থা (নবাবী আমল)

রাজস্ব ব্যবস্থা

১৭১০ সালে মুর্শিদকুলী খান নায়েব সুবেদার নিযুক্ত হয়ে উপর্যুক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকার ভূমির খাজনা আদায়ের জন্য নতুন ইজারাদার নিযুক্ত করেন এবং আদায়কৃত খাজনা থেকে ইজারাদারদের কিছু অংশ প্রদানের ব্যবস্থা নেন। মুসলমান কর্মচারী/ইজারাদারগণ ঠিকমত রাজস্ব জমা দিতনা বলে তিনি বেশীরভাগ ক্ষেত্রে হিন্দু ইজারাদার নিয়োগ করে অধিক রাজস্ব আদায় নিশ্চিত করেন। ফলে বহুকাল ধরে গড়ে উঠা মুসলিম ইজারাদার বা জমিদার পরিবারগুলো দরিদ্র হয়ে পড়ে এবং নতুনভাবে হিন্দু ইজারাদার ও জমিদার শ্রেণী গড়ে ওঠে।

প্রশাসন

নবাবী আমলের প্রায় সকল নবাব মোগল আমলের শাসন ব্যবস্থা সামান্য পরিবর্তন করে বাকী কাঠামো পূর্ববৎ বহাল রেখেছিলেন। তাঁরা দিল্লীর সম্রাটের আইন সঙ্গত কর্তৃত্ব স্বীকার করতেন এবং সুবাদার, দেওয়ান ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিয়োগ, উপাধি প্রদান প্রভৃতি ক্ষেত্রে সম্রাটের অনুমোদন গ্রহণ করতেন। তবে প্রশাসনিক সকল ক্ষমতা তখন সুবাদার তথা নবাবগণ নিজেদের নিকট কেন্দ্রীভূত করে নিয়েছিলেন।

নবাবী আমলে নবাবের প্রধানমন্ত্রীর উপাধি ছিল 'দেওয়ান-ই-খালসা'। তিনি রাজ্যের রাজস্ব প্রশাসনের জন্য দায়ী ছিলেন। সেনাবাহিনীর তদারক ও বেতন প্রদানের জন্য নিযুক্ত মন্ত্রীকে বলা হতো 'দেওয়ান-ই-তান'। মুর্শিদকুলী খানের সময়ে দেওয়ান-ই-তান পদে সর্বদা হিন্দু কর্মচারীকে নিয়োগ প্রদান করা হতো। রাজস্ব আদায় ও নির্ধারণের ক্ষেত্রে একজন 'সদর কানুনগো' নিযুক্ত থাকতেন, যা মোগল সাম্রাজ্যের সকল প্রদেশেই ছিল। সদর কানুনগোবৃন্দ স্থায়ীভাবে ঐ পদে নিযুক্ত থাকতেন বলে রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে নবাবকে তার মুখাপেক্ষী হতে হতো। নবাবের গোলন্দাজ বাহিনীর প্রধানকে বলা হতো বখ্সী এবং নৌবাহিনীর প্রধানকে বলা হতো মীরবহর। নবাব আলীবর্দীর মীরবহর ছিলেন সিরাজউদ্দৌলা।

বিচার বিভাগের দায়-দায়িত্ব কাজীর উপর ন্যস্ত ছিল এবং তাঁর যথেষ্ট ও পর্যাপ্ত স্বাধীনতা ছিল। নগর প্রশাসনের দায়িত্বে নিযুক্ত থাকতেন 'কোতোয়াল'। নবাবের একটি গোয়েন্দা বিভাগ ছিল, যার প্রধানকে বলা হতো 'দারোগ-ই-হরকরা'। এছাড়া প্রশাসনের সার্বিক তদারককারী, বার্তালেখক ও বিবরণলেখক হিসেবে একজন 'বকাইনবীশ' (ওয়াকিয়ানবীশ) কার্যরত ছিলেন।

নবাবী আমলে সুবা বাংলা বলতে বাংলাদেশ ও উড়িষ্যাকে বুঝানো হতো এবং নবাব আলীবর্দীর আমলে বিহার প্রদেশও সুবা বাংলার অন্তর্ভুক্ত হয়। বিহার ও উড়িষ্যার শাসনকার্যের জন্য দু'জন 'নায়েব-ই-সুবা' নিযুক্ত করা হয়। তখন ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট এলাকার জন্যও একজন নায়েব-ই-সুবা নিযুক্ত করা হয়েছিল। একে 'জাহাঙ্গীরনগর' উপ-প্রদেশ বলা হতো। নায়েব-ই-সুবা তাঁর অঞ্চলের রাজস্ব আদায়ের জন্য একজন দেওয়ান নিযুক্ত করতেন।

মুর্শিদকুলী খান শাসনকার্যের সুবিধার্থে প্রত্যেকটি প্রদেশে কতগুলো 'চাকলা' (বিভাগ) সৃষ্টি করেন। সুবা বাংলায় তখন ১৩টি চাকলা ছিল। চাকলার শাসনকর্তাকে বলা হতো 'ফৌজদার'। চাকলাগুলোর অধীনে ছিল কিছু পরগণা বা মহাল। ফৌজদারের দায়িত্ব ছিল চাকলার আইন-শৃঙ্খলা বিধান, রাজস্ব আদায়কারীকে সহায়তা প্রদান এবং অবাধ্য জমিদার বা প্রজা দমন।

প্রতিটি চাকলার বিচার কার্যের জন্য একজন কাজী নিযুক্ত থাকতেন। অনেক চাকলায় একজন করে কোতোয়ালও নিযুক্ত ছিলেন।

প্রতিটি পরগণা বা মহালে রাজস্ব আদায়ের জন্য একজন কর্মচারী নিযুক্ত থাকতেন যার পদবী ছিল 'আমিল' বা 'মুতাসাররিফ'। অনেক ঐতিহাসিকের মতে পরগণার প্রশাসককে বলা হতো শিকদার। আবার অনেকে শিকদার ও আমিল দুটি পদবীকেই রাজস্ব আদায়কারী রূপে বর্ণনা করেন। আমীলকে রাজস্ব আদায়ে সহায়তা করতেন 'কারকুন' পদবীর কর্মচারী। আদায়কৃত রাজস্ব সংরক্ষণের জন্য যিনি খাজাঞ্চি হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন, তাঁকে 'ফোতাহদার' বলা হতো। এই শব্দটি বাংলায় পরে 'পোদ্দার' শব্দে রূপান্তরিত হয়। পরগণার গ্রাম/মৌজার ভূমির সীমারেখা নির্ধারণ ও পরিমাপের জন্য 'আমীন' নামক পদবীধারী কর্মচারী কার্যরত ছিল। পরগণার রাজস্ব সংক্রান্ত রীতি-নীতি ও নিয়ম-কানুন সংরক্ষণ ও বলবৎ করার জন্য 'কানুনগো' নামের কর্মচারী নিযুক্ত থাকতো।

স্বাধীন নবাবী আমলেও নবাবের দরবারের জন্য পরিষদ গঠিত হতো। মন্ত্রণাদাতা হিসেবে উজির, প্রধান সেনাপতি, অন্যান্য সেনাপতি, প্রধান খাজাঞ্চি, নগররক্ষক, টাকশাল প্রধান ও অমাত্য বর্গ তথা আমীরগণ কার্যরত থাকতেন।

ছক :২

স্বাধীন নবাবী আমলে বাংলার প্রশাসনিক পদসোপান

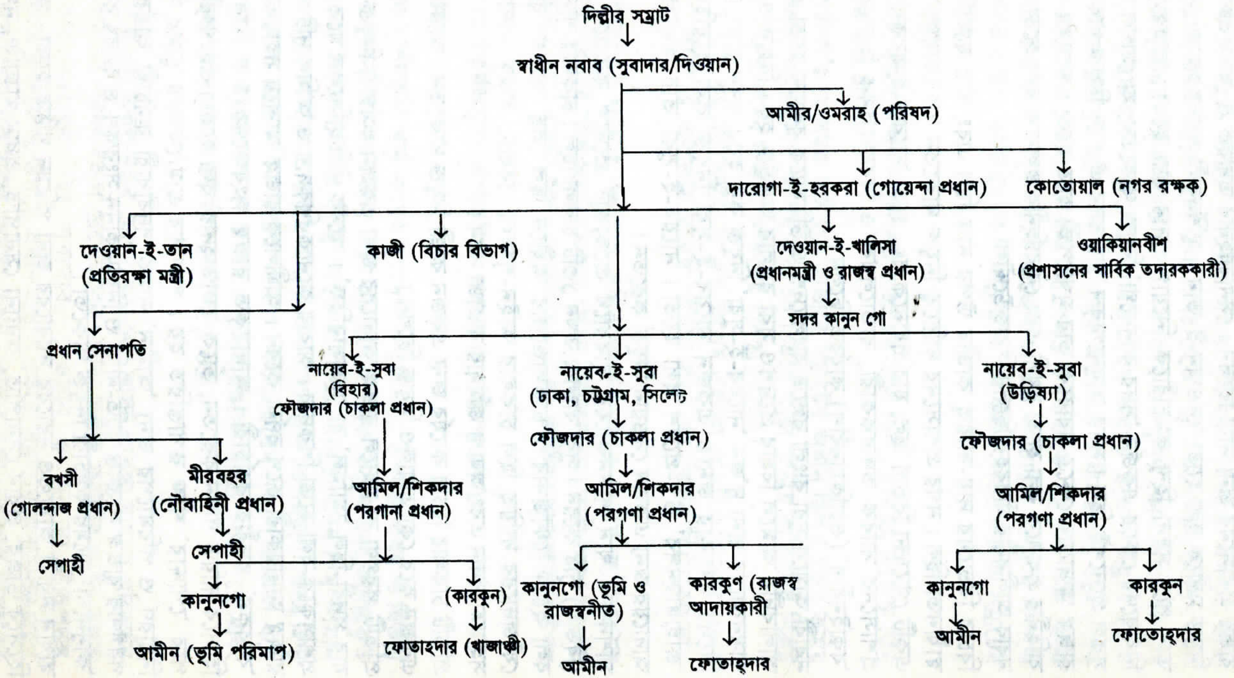

অর্থনৈতিক অবস্থা

মধ্যযুগে বাংলার অধিবাসীদের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ বিরাজমান ছিল। এদেশের মৌসূমী জলবায়ুর কারণে সেচবিহীন কৃষি ব্যবস্থা, কৃষিতে নারী ও পুরুষের সম্মিলিত শ্রম প্রদান, উৎপাদিত ও উদ্বৃত্ত দ্রব্যের সুলভতা, বৈদেশিক বাণিজ্য প্রভৃতি কারণে এদেশ প্রাচুর্যে ভরপুর ছিল। মধ্যযুগের মুসলিম শাসকবৃন্দের আগমন ঘটে তুরস্ক, ইরান, খোরাসান, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশ থেকে এবং তাঁরা বাংলার উৎপাদিত দ্রব্যাদি মধ্য-এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের দেশসমূহে বিক্রির জন্য বাণিজ্য ব্যবস্থার উন্নতি ঘটান। ফলে এদেশের উৎপাদিত দ্রব্য পূর্বের তুলনায় অধিক মূল্যে বিক্রির ব্যবস্থা হয় এবং জনগণ স্বর্ণ ও রোপ্যমুদ্রা প্রভূত পরিমাণে আয় করে।

মধ্যযুগের পূর্বে পাল ও সেন রাজাদের আমলে বাংলার সঙ্গে বহির্দেশীয় বাণিজ্যের তেমন প্রসার না ঘটায় জনগণের নিকট স্বর্ণ ও রোপ্য মুদ্রা তেমন একটা ছিলনা। সর্বত্র দ্রব্যের বিনিময়ে দ্রব্য বিক্রি অথবা কড়ির মাধ্যমে দ্রব্য বিক্রি ব্যবস্থা চালু ছিল। মুসলিম শাসকবৃন্দ নিজেরা স্বর্ণ ও রোপ্যমুদ্রা তৈরী ও প্রচলন করে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে একে সহজলভ্য করেন। মিনহাজ নামক ঐতিহাসিকের মতে "যখন মুসলিম বিজেতারা এদেশে প্রবেশ করেন তখন তাঁরা কোন রকম স্বর্ণ বা রোপ্য মুদ্রা দেখতে পাননি। ক্রয় বিক্রয়ে কড়ি ব্যবহৃত হতো। এমনকি রাজা পর্যন্ত কড়ির মাধ্যমে দান ও উপহার প্রদান করতেন।" মোগল শাসনামলে বাংলার উৎপাদিত পণ্য এশিয়ার সর্বত্র বিক্রির ব্যবস্থা হওয়ার ফলে দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং জনগণ অধিক উৎপাদনে ব্রতী হন। ফলে এদেশ অল্প দিনেই সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠে।

একটা দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ও সমৃদ্ধি পরিমাপের ক্ষেত্রে চারটি বিষয়কে প্রাধান্য দেয়া হয়। প্রথমত কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের ব্যাপক উৎপাদন, দ্বিতীয়ত বিপুল আকারের বৈদেশিক বাণিজ্য, তৃতীয়ত অত্যাবশকীয় দ্রব্যাদির সুলভতা এবং চতুর্থত দেশে স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিপুল পরিমাণে সঞ্চয়। মধ্যযুগে বাংলায় চারটি অত্যাবশকীয় উপাদান উল্লেখ্যযোগ্য পরিমাণে ছিল এবং অর্থনৈতিক অবস্থার প্রভূত উন্নতি ধারণা করা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত (আসাদুজ্জামান, ১৯৮২, পৃ: ৪৮১)।

কৃষি

অসংখ্য নদ-নদী বিধৌত বাংলাদেশ পলিমাটি সঞ্জাত হয়ে অত্যন্ত উর্বরা কৃষি ক্ষেত্র সৃষ্টি করে রেখেছে সেই প্রাচীনকাল থেকে। তদুপরি মৌসূমী জলবায়ুর ফলে প্রচুর বৃষ্টিপাতও এদেশে কৃষিজ পণ্য উৎপাদনে সহায়ক ছিল। ফলে এদেশে মধ্যযুগেও কৃষিজ পণ্যের প্রাচুর্য ছিল। প্রসিদ্ধ পর্যটক ইবনে বতুতা বর্ণনা করেছেন, তিনি মেঘনার উভয় তীরে উদ্যানরাজি, শস্যপূর্ণ মাঠ ও জনবহুল গ্রামসমূহ দেখতে পান। সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে পর্যটক 'বার্ণিয়ারা' বাংলাদেশ পরিভ্রমণ করে লিখেন যে, তিনি সমগ্র প্রদেশব্যাপী বহু নদী-নালা ও খাল-বিল দেখতে পেয়েছেন এবং এগুলোর চতুর্দিকে শস্য ও ফলে ভরা উর্বর ও সবুজ মাঠ এবং শ্রেণীবদ্ধ ঘন বসতিপূর্ণ বহু শহর ও গ্রাম সাজানো ছবির মত শোভা পাচ্ছিল। চৈনিক পরিব্রাজক ও দূতগণ বর্ণনা করেছেন যে, 'বাংলায় পুরুষ ও রমণী উভয়ে মাঠে কাজ করে। তাদের শস্যের

মৌসুম শেষ হলে অবসর সময়ে তারা কাপড় বুননের কাজে নিয়োজিত হয়" (আসাদুজ্জামান, ১৯৮২, পৃ ৪৮২)।

মধ্যযুগে বাংলায় প্রচুর পরিমাণে ধান, গম, ইক্ষু, পাট, নীল, আফিম, লাক্ষা, সুতা (তুলা) প্রভৃতি কৃষিপণ্য উৎপন্ন হতো। সম্রাট আকবরের সভাসদ আবুল ফজল বাংলাদেশের নানা প্রকার ফুল ও ফলের প্রাচুর্যের কথা উল্লেখ করে বলেন "যারা সুপারী খায় তাদের মুখ লাল রঙে রঞ্জিত হয়। সুপারী ও পান বাংলায় পর্যাপ্ত পরিমাণে জন্মে। অন্যান্য ফল যা জন্মায় তা হলো, আম, কাঁঠাল, কলা, ডালিম, খেজুর, কমলা, সানতারাহ ইত্যাদি " (প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৯০)।

শিল্প-কারখানা

মধ্যযুগের মুসলিম শাসনামলে বাংলাদেশে রেশমী ও পশমী বস্ত্র, নানা রকম অলংকার ও সূক্ষ্ম সূচিকর্মের দ্রব্যাদি উৎপাদন প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাংলার তৈরী 'মসলিন' পৃথিবী ব্যাপী সুখ্যাতি অর্জন করেছিল। সে আমলে ইক্ষু থেকে চিনি উৎপাদন প্রক্রিয়া আরম্ভ হয় এবং এটি একটি প্রধান শিল্পে পরিণত হয়, যদিও তা কুটির শিল্পের আকারে ঘরে তৈরী করা হতো। ১৭৫৬ সালে এ দেশ থেকে ৫০ হাজার মন চিনি রপ্তানী করা হয়েছিল।

চৈনিক পরিব্রাজকগণ বাংলার কার্পেট, কাগজ, ইস্পাত নির্মিত দ্রব্য, কামান, বন্দুক বিভিন্ন ধাতুর অলংকারাদি নির্মাণের ক্ষেত্রে শিল্পের উন্নতির কথা উল্লেখ করেন। কৃষি সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, লোহার জিনিষপত্র ও অস্ত্র-শস্ত্র ধাতব শিল্পের উন্নতির পরিচয় দেয়। বাংলায় তখন উৎকৃষ্টমানের অত্যন্ত শক্ত দু'ধারী তরবারী প্রস্তুত করা হতো।

সমুদ্রের পানি থেকে লবণ উৎপাদন তখন একটি ব্যাপক শিল্পের মর্যাদা পেয়েছিল। নদী ও সমুদ্রের মাছের শুটকী প্রস্তুতকরণ শিল্পেও বাংলাদেশ অগ্রগামী ছিল। লবণ ও শুটকী বিদেশে রপ্তানী করা হতো।

বাণিজ্য

কৃষিজ ও শিল্পজাত দ্রব্যের প্রাচুর্য এবং মুসলিম নাবিকদের সমুদ্র যাত্রায় পারদর্শিতা মধ্যযুগে বাংলাদেশকে বাণিজ্যে অগ্রগামিতা এনে দেয়। এর পূর্বে বাঙ্গালীর সমুদ্র যাত্রার ক্ষেত্রে অনীহা ছিল। মধ্যযুগে মুসলমানদের সাফল্য ও উদ্দীপনা দেখে এদেশের হিন্দু অধিবাসীগণও নৌবহরের মাধ্যমে বাণিজ্য প্রথায় অগ্রণী হয়ে ওঠে। তখন বাংলার বন্দরে আরব, ইরান, পর্তুগাল, হল্যান্ড, আর্মেনিয়া ও ফ্রান্সের বাণিজ্য জাহাজের আগমন অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল। মুসলিম শাসনের প্রারম্ভেই চট্টগ্রাম একটি প্রসিদ্ধ বন্দরে পরিণত হয়। সাতগাঁও ছিল বৈদেশিক বাণিজ্যের আর একটি বড় বন্দর। পর্তুগীজগণ চট্টগ্রাম বন্দরকে 'পোর্টোগ্রান্ডি' (বড় বন্দর) এবং সাত গাঁওকে 'পোর্টো পিকেনো' (ছোট বন্দর) বলে অভিহিত করতো। ষোড়শ শতকের শেষার্ধে ভাগিরথী-গঙ্গার গতি পরিবর্তনের ফলে সাতগাঁও বন্দরের অবনতি ঘটে এবং হুগলী বন্দর প্রাধান্য পায়। ১৭৫০ সালে বাংলা থেকে ইংরেজ, ডাচ, ফরাসী ও আর্মেনীয়গণ

বস্ত্র ক্রয় করেন ১কোটি ৫০ লক্ষ টাকার। অন্যান্য দ্রব্যের মোট হিসেবে বাংলার আয় ছিল প্রায় ২কোটি টাকা (প্রাগুক্ত, পৃ; ৫০৬)।

বাংলার রপ্তানী দ্রব্যের মধ্যে সূতি ও রেশমী বস্ত্র, চাল, চিনি, লবণ, আদা, মরিচ, গরম মসলা, লাক্ষা, হরিতকী অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিল। লাক্ষার বাণিজ্যে বাংলাদেশের একচেটিয়া প্রাধান্য ছিল। বার্ণিয়ার মন্তব্য করেন যে, "পৃথিবীর আর কোথাও বাংলার মত নানা ধরনের মূল্যবান পণ্য দ্রব্য বিদেশী বণিকদেরকে আকৃষ্ট করতে দেখা যায় না।" (প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫০১)।

আর্থিক সমৃদ্ধি

কৃষিজ ও শিল্পজাত দ্রব্যের প্রাচুর্য এবং বিদেশে রপ্তানীর ক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তারের ফলে মধ্যযুগে বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটেছিল। সাধারণ অধিবাসীবৃন্দও তখন সচ্ছলতার সঙ্গে জীবন যাপন করতে পারতেন। এ প্রসঙ্গে বার্ণিয়ার বলেন "ভাত ও ঘি এর সঙ্গে তিনি চার রকমের তরি-তরকারী সাধারণ লোকের প্রধান খাদ্য ছিল এবং এসব অতি সামান্য দামে কেনা যেতো।" তখনকার দিনে বাংলার সমৃদ্ধি ও সুলভতার ফলে ইউরোপীয়দের মাঝে একটি প্রবাদ ছিল যে, "বাংলা রাজ্যে প্রবেশের শত দরজা খোলা আছে, কিন্তু ফেরবার একটি দরজাও নেই।" (প্রাগুক্ত, পৃ: ৫১৩)।

চৈনিক দূতগণ উল্লেখ করেছেন যে, "বাংলার লোকেরা সোনার ও রূপার পাত্রাদি ব্যবহার করত।" আলাউদ্দিন হোসেন শাহ্ (ষোড়শ শতক) গৌড়ের লুণ্ঠণকারীদের বধ করে ১৩০০ সোনার থালা ও বহু ধনরত্ন পেয়েছিলেন (মজুমদার, ১৯৮৭, পৃ: ২২৫)।

সম্রাট হুমায়ুন বাংলার রাজধানী গৌড়ে এসে অধিবাসীদের স্বচ্ছলতা দেখে এ রাজ্যের নাম রাখেন 'জান্নাতাবাদ'।

মধ্যযুগে এদেশে ব্যাংক ব্যবস্থার প্রচলন ঘটে, যা হুন্ডির আকারে কার্যকর হতো। এদের মাধ্যমে বিভিন্ন স্থানে মুদ্রার আদান প্রদান করা যেতো।

সুলভ জীবনযাত্রা

তখন এদেশে উৎপাদন (কৃষিজ ও শিল্পজ) এত বেশী ছিল যে, বিদেশে রপ্তানী করেও দেশে প্রচুর উদ্বৃত্ত থাকতো। ফলে জীবন-যাপনের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি অত্যন্ত সস্তা ছিল। শায়েস্তা খানের আমলে বাংলাদেশে টাকায় আট মন চাল ক্রয় করা যেতো। ইটালীর বণিক 'বারথেমা' এদেশের সর্বত্র জিনিষপত্রের প্রাচুর্য ও স্বল্প মূল্য দেখে বিস্মিত হয়ে মন্তব্য করেন যে, "পৃথিবীর মধ্যে এদেশ বসবাসের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট স্থান।" 'সিবাস্তিয়ানা' মানরিক মন্তব্য করেন যে, বাংলাদেশের শহরগুলোতে বিশেষ করে খাদ্য দ্রব্যের মূল্য এত কম ছিল যে তিনি দিনে কয়েকবার আহার করতে প্রলুব্ধ হতেন।

প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের সুলভতার একটি ধারণা ইবনে বতুতার বর্ণনা থেকে পাওয়া যেতে পারে। তিনি বিভিন্ন দ্রব্যের দামের একটি তালিকা উল্লেখ করেছেন।

পরিমাণসহ দ্রব্য	দাম (১৯৭৩ সালে ভারতীয় মুদ্রা মান অনুসারে)
১মন চাল	০.১২ টাকা
১মন ঘি	১.৪৫ টাকা
১মন চিনি	১.৪৫টাকা
১ মন তিল তেল	০.৭৩টাকা
১৫গজ উত্তম কাপড়	২.০০ টাকা
১টি দুগ্ধবতী গাভী	৩.০০ টাকা
১টি মোটা ভেড়া	০.২৫ টাকা
২টি মুরগী	০.২০ টাকা

(সূত্র : মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, পৃ; ২২৬)

উপরের বর্ণনা থেকে সহজেই অনুমেয় যে, তখন বাংলাদেশে জীবন যাপনের দ্রব্যাদি অত্যন্ত সুলভ ছিল। একজন বৃদ্ধ বাঙ্গালী মুসলমান ইবনে বতুতাকে জানিয়েছিলেন যে, তিনি, তাঁর স্ত্রী ও একজন ভৃত্যের খাদ্যের জন্য সারা বছরে ১টাকা ব্যয় হয়।

উপসংহার

অষ্টাদশ শতাব্দীতে সরকারী কাগজপত্রে বাংলাদেশকে বলা হতো 'ভারতের স্বর্গ' (মজুমদার, ১৯৮৭, পৃ: ২২৭)। ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধি, প্রাকৃতিক শোভা, শিল্প ও কৃষিজ দ্রব্য সম্ভার এবং জীবন যাত্রার স্বচ্ছলতার কারণেই এরূপ মন্তব্য করা হতো। তবে অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দের পাশাপাশি এদেশের শাসনকর্তাদের মধ্যে সিংহাসন দখল করাকে কেন্দ্র করে এত বেশী যুদ্ধ বিগ্রহ হয়েছিল যে সর্বদাই অধিবাসীদেরকে উৎকণ্ঠিত থাকতে হতো। তাঁদের ধন সম্পদ লুণ্ঠিত হয়েছে বহুবার।

মধ্যযুগের প্রশাসনিক ব্যবস্থা বিশেষ করে রাজস্ব আদায়ের পদ্ধতি (যা প্রশাসনিক ও রাজস্ব আদায় ব্যবস্থা সম্পর্কে এ প্রবন্ধে বর্ণিত হয়েছে) অত্যন্ত সফল ছিল। ফলে নতুন শাসনকর্তাকেও রাজস্ব আদায়ে বেগ পেতে হয়নি। প্রশাসনিক স্তর নির্ধারণ ও পদসোপান যেভাবে রচিত হয়েছিল, তা আজও বহুলাংশে অনুসৃত হয়ে আসছে। বর্তমান বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থায় মধ্যযুগের ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থা অনেকাংশে অনুসৃত হয়, এমনকি আমীন, কানুনগো প্রভৃতি পদবীসমূহও ব্যবহৃত হচ্ছে। দুই শত বছর বৃটিশ রাজত্বের সময়ও এদেশের রাজস্ব আদায় ও ভূমি ব্যবস্থাপনায় মধ্য যুগের পদ্ধতি অনেকাংশেই অনুসৃত হয়েছে। তবে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের পর ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় মৌলিক পরিবর্তন সূচিত হয়। পরিষদ, মন্ত্রীসভা, সেনাবাহিনী

প্রভৃতির গঠন প্রণালীও মধ্যযুগের শাসন ব্যবস্থা থেকে অনুকরণের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে বাংলার শাসন ব্যবস্থায় যে মন্থরতা ও অশ্রেণীবদ্ধতা ছিল, মধ্যযুগের শাসন ব্যবস্থা তা রাতারাতি পাল্টে দিয়ে প্রশাসনে একটি বিধিবদ্ধ ও সার্থক বিবর্তনের জন্ম দিয়েছিল।

গ্রন্থপঞ্জি

১। মজুমদার, রমেশচন্দ্র (সম্পাঃ) ১৯৮৭, *বাংলাদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ)*, কলিকাতা : জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যন্ড পাবলিশার্স প্রা: লি:।

২। বন্দোপাধ্যায়, রাখালদাস, ১৯১৭, *বাঙ্গালার ইতিহাস (দ্বিতীয় ভাগ)*, কলিকাতা।

৩। সেন, দীনেশচন্দ্র, ১৩৪১, *বৃহৎবঙ্গ*, কলিকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

৪। সেন, সুকুমার, ১৩৫২, *মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী*, কলিকাতা : বিশ্বভারতী।

৫। বন্দোপাধ্যায়, কালী প্রসন্ন, (মজুমদার রমেশ চন্দ্রের (সম্পা) গ্রন্থে উদ্ধৃত) ১৯৮৭।

৬। আসাদুজ্জামান, মোহাম্মদ ও ফজলে রাব্বি (অনুঃ) ,১৯৮২, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস* (১৫৭৬-১৭৫৭) দ্বিতীয় খন্ড, ঢাকা : বাংলা একাডেমী।

৭। বিশ্বভারতী, কলিকাতা, ১৯৪৬, *চৌনিক বিবরণ বিশ্বভারতী বার্ষিকী*, ১৯৪৫ বর্ষ, প্রথম খন্ড (পৃঃ ৯৬-১৩৪), কলিকাতা।

লোক প্রশাসন সাময়িকী
৯ম সংখ্যা, জুন ৯৭, আষাঢ় ১৪০৪

যুগপরিক্রমায় জেলা পরিষদ ঃ বর্তমান কাঠামো ও ভবিষ্যত সম্ভাবনা

মুহাম্মদ আব্দুল কাদের *

ভূমিকা

গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের লক্ষ্যে এই উপ-মহাদেশে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বিকশিত করার জন্য দীর্ঘদিন ধরে প্রচেষ্টা চলে আসছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে উপর্যুক্ত নির্দেশনার আলোকে বাংলাদেশের শাসন কাঠামোয় ক্ষমতাসীন সরকারগুলি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বিকাশ সাধন এবং ক্ষমতায়নের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে গ্রাম পর্যায়ে স্থানীয় সরকার গঠনের জন্য দু'বার প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছিল এবং থানা পর্যায়ে উপজেলা পরিষদ নামে শক্তিশালী স্থানীয় সরকার গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। সেই সাথে ঐতিহ্যবাহী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদ এবং জেলা পরিষদকে শক্তিশালীকরণের জন্য বেশ কয়েকবার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। গ্রাম পর্যায়ে "গ্রাম সরকার" এবং "পল্লী পরিষদ" নামক প্রতিষ্ঠান দুটি গঠন করার জন্য পর্যায়ক্রমে জিয়া সরকার এবং এরশাদ সরকার প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। এজন্য আইনগত ভিত্তিও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এ প্রতিষ্ঠান দু'টি সূচনা পর্বেই হোঁচট খেয়ে পড়ায় আলোর মুখ দেখতে পায়নি।

এদেশে সুসংগঠিতভাবে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানাদির বিকাশ ঘটানোর প্রচেষ্টার প্রতিফলন আমাদের সংবিধানে ঘটেছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে-"রাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে উৎসাহ দান করিবেন এবং এই সকল প্রতিষ্ঠান সমূহে কৃষক, শ্রমিক, এবং মহিলাদিগকে যথা সম্ভব বিশেষ প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হইবে।" (অনুচ্ছেদ-৯) তাছাড়া সংবিধানের চতুর্থ ভাগের তৃতীয় পরিচ্ছেদে স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলি কিভাবে পরিচলিত হবে, এসব প্রতিষ্ঠানের এখতিয়ার, কর্ম-পরিধি এবং আর্থিক ক্ষমতা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সংবিধানের ৫৯নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে ঃ

" (১) আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হইবে।

---

* উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

(২) এই সংবিধান ও অন্য কোন আইন-সাপেক্ষে সংসদ আইনের দ্বারা যেরূপ নির্দিষ্ট করিবেন, এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় উল্লিখিত অনুরূপ প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান যথোপযুক্ত প্রশাসনিক একাংশের মধ্যে সেইরূপ দায়িত্ব পালন করিবেন এবং অনুরূপ আইনে নিম্নলিখিত বিষয় সংক্রান্ত দায়িত্ব অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিবে ঃ-

(ক) প্রশাসন ও সরকারী কর্মচারীদের কার্য;

(খ) জনশৃঙ্খলা রক্ষা;

(গ) জনসাধারণের কার্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।"

আর স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা বর্ণনা করতে গিয়ে ৬০নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে,

"এই সংবিধানের ৫৯অনুচ্ছেদের বিধানাবলীতে পূর্ণ কার্যকারিতা দানের উদ্দেশ্যে সংসদ আইনের দ্বারা উক্ত অনুচ্ছেদে উল্লেখিত স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় প্রয়োজনে কর আরোপ করিবার ক্ষমতাসহ বাজেট প্রস্তুতকরণ ও নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা প্রদান করিবেন।"

বর্তমানে যে কয়টি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কার্যকারিতার সাথে টিকে আছে বা কাজ করছে তার মধ্যে জেলা পরিষদ অন্যতম পুরাতন প্রতিষ্ঠান। খুব সামান্য মাত্রায় নামের পরিবর্তন ছাড়া আজকের জেলা পরিষদ নামক প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘদিন ধরে স্বকীয় ধারায় বিকশিত হয়েছে।

স্থানীয় সরকার পদ্ধতির ক্রমবিকাশ

বৃটিশদের আগমনের পূর্বে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার পদ্ধতি কিরূপ ছিল সে সম্বন্ধে খুব একটা নির্ভরযোগ্য দলিল পাওয়া যায় না। তবে এটা ধারণা করা হয় যে, তখন অধিকাংশ গ্রামে পঞ্চায়েত প্রথা প্রচলিত ছিল যা কিনা গোত্র বা বর্ণভিত্তিক ছিল। পর্যায়ক্রমে গ্রামভিত্তিক পঞ্চায়েত ব্যবস্থার বিকাশ ঘটে বলে ইতিহাস বিশ্লেষকরা বলেন। তবে বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্যও পঞ্চায়েত গঠিত হতো। গ্রামের ভূস্বামী বা কৃষকের সাথে ভৃত্যের গোলমাল মিটানোর জন্য পঞ্চায়েত গঠিত হওয়ার নজির পাওয়া যায়। জনগণের মতামতের উপর ভিত্তি করে সামাজিক প্রয়োজনে স্বাভাবিকভাবেই পঞ্চায়েত প্রথার উদ্ভব ঘটে। এই পঞ্চায়েতের কোন আইনগত ভিত্তি বা বৈধতার ভিত্তি ছিলনা।

মুঘলদের আগমনের পরে নতুন ধরনের ও সুসংবদ্ধ পদ্ধতির শাসন ব্যবস্থার বিকাশ ঘটে। মুঘলরা মুলত সুবা ও সরকার পদ্ধতির প্রশাসনিক কাঠামোর বিকাশ ঘটায়। সুবার পরিচালককে সুবাদার এবং সরকারের পরিচালককে শিকদার বলা হতো। আর তার প্রশাসনিক ইউনিটকে পরগণা হিসেবে চিহ্নিত করে সুসংগঠিত শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। এই পরগণাসমূহের সুসংবদ্ধভাবে শাসনকার্য পরিচালনার লক্ষ্যে ফৌজদার, কাজী ও মীরডাল নিয়োগ করা হয়। গ্রামে গ্রামে গ্রাম-প্রধান ও চৌকিদার নিয়োগ করা হয়। মুঘল শাসনামলে গ্রামীণ প্রশাসনের পাশাপাশি কোতোয়াল নিয়োগ করার মাধ্যমে মিউনিসিপ্যাল কার্যাদি এবং প্রশাসনিক কার্যাদি যৌথভাবে সম্পন্ন করা

হতো। প্রতিটি ওয়ার্ডের জন্য একজন মীর মহল্লাহ থাকতেন। এদিকে একজন কাজী বিচারকার্য সম্পাদনের জন্য নিযুক্ত হতেন। বিনামূল্যে খাদ্য ও আশ্রয় দেয়ার জন্য প্রতিটি শহরে খানকাহ এর ব্যবস্থা ছিল।

বৃটিশদের এদেশে আগমনের পরে গ্রাম এলাকায় জমিদারী প্রথা এবং শহর এলাকায় মিউনিসিপ্যালিটি প্রথা সৃষ্টি করা হয়। জমিদারগণের বিলাস বহুল জীবনযাপনের প্রতি আসক্তির কারণে পর্যায়ক্রমে তারা জনহিতকর কার্যক্রম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে থাকে। অপরদিকে জনসাধারণের উপরে অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধির প্রতিবাদ স্বরূপ ১৮৫৭ সালে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামে (বৃটিশ ঐতিহাসিকগণ একে সিপাহী বিদ্রোহ বলে অভিহিত করেছেন) এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এমতাবস্থায় বৃটিশ সরকার পল্লী অঞ্চলে প্রশাসনের ভিত্তিকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠার জন্য ১৮৭০ সালে চৌকিদারী পঞ্চায়েত আইন পাশ করে।

চৌকিদারী পঞ্চায়েত আইন-১৮৭০ ঃ

এই আইনের বলে পল্লী অঞ্চলে কয়েকটি গ্রামকে নিয়ে চৌকিদারী পঞ্চায়েত গঠন করা হয়। এর সদস্য সংখ্যা পাঁচজন ছিল। সরকার পঞ্চায়েতের সকল সদস্যকে তিন বছরের জন্য নিয়োগ করতেন। পঞ্চায়েতের দায়িত্ব ছিল শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক চৌকিদার নিয়োগ করা এবং চৌকিদারী ট্যাক্স আদায় করে তা দিয়ে তাদের বেতন পরিশোধের ব্যবস্থা করা।

তবে চৌকিদারী পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় সদস্যগণ জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এর এজেন্ট হিসেবে কাজ করায় তারা স্বাধীনভাবে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন না বা কোন উন্নয়নমূলক বা জনকল্যাণমূলক কাজ করতে পারতেন না তাদের এখতিয়ারের সীমাবদ্ধতার কারণে। এসব কারণে চৌকিদারী পঞ্চায়েত ব্যবস্থার পরিবর্তে স্থানীয় পর্যায়ে অধিক দায়িত্বশীল সরকার গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ১৮৮৫ সালে বঙ্গীয় স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন আইন প্রবর্তনের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গঠন ও বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেয়া হয়।

এই আইন দ্বারা ইউনিয়ন কমিটি, লোকাল বোর্ড এবং জেলা বোর্ড গঠন করার দ্বারা পর্যায়ক্রমে ইউনিয়ন, মহকুমা ও জেলাপর্যায়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ গঠন ও বিকাশ করার পথ সুপ্রশস্ত করা হয়। অর্থাৎ ১৮৮৫ সালে প্রবর্তিত এই আইন দ্বারা এ উপমহাদেশে জেলা বোর্ড প্রথমবারের মতো আত্মপ্রকাশ করে। এর পরে কালের বিবর্তন ধারায় জেলা বোর্ড আজকের জেলা পরিষদ রূপে অভিহিত হচ্ছে।

জেলা পরিষদের উদ্ভব

জেলা পরিষদের সৃষ্টি থেকে শুরু করে অদ্যাবধি স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত যতগুলি আইন প্রণীত হয়েছে তার পর্যায়ক্রমিক বর্ণনার মাধ্যমে জেলা পরিষদের বিকাশ প্রক্রিয়া সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করা হলো।

১৮৭১ সালে বাংলা (বেঙ্গল) প্রাদেশিক আইন পরিষদ কর্তৃক সড়ক সেস আইন (Road Cess Act) ১৮৭১ গৃহীত হয়। এই আইনের দ্বারা প্রতিটি জেলায় 'জেলা সড়ক কমিটি' নামক একটি করে কমিটি গঠনের ব্যবস্থা করা হয়। অবশ্য এ

কমিটির সকল সদস্যই সরকার কর্তৃক মনোনীত বা নিযুক্ত হতেন। এর মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য ছিলেন বেসরকারী এবং বাকী এক-তৃতীয়াংশ সদস্য ছিলেন সরকারী কর্মচারী। আর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এ কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। যাতায়াতের জন্য সড়ক নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা ছিল জেলা পরিষদের মূল কাজ। এ কমিটিই সেসের হার নিরূপণ করতো। আবার সেস আদায়ের পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া এ কমিটি নির্ধারণ করে দিতো। এভাবে জেলা প্রশাসন প্রক্রিয়ার মধ্যে স্থানীয় পর্যায়ের জনসাধারণ অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করেন। জেলা পরিষদ ব্যবস্থার প্রাথমিক কাঠামো বা ভিত এভাবে এই আইনের দ্বারা গ্রথিত হয়েছিল।

বঙ্গীয় স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন আইন-১৮৮৫ ঃ

স্থানীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানগুলির উপরে লর্ড রিপোন কর্তৃক ১৮৮২ সালে উপস্থাপিত রেজুলেশনের উপর ভিত্তি করে মুলত রেজুলেশনটির সংশোধিত রূপে ১৮৮৫ সালে বঙ্গীয় স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন আইন হিসেবে পাশ হয়। এই আইনে আনুপাতিক হারে অধিক জনপ্রতিনিধিত্বশীল প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশের সুযোগ রেখে তিন স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার পদ্ধতি চালু করার বিধান প্রবর্তিত হয়। এগুলি ছিল ঃ

(ক) ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন কমিটি (তবে পাশাপাশি চৌকিদারী পঞ্চায়েত ব্যবস্থাটিও চালু রাখা হয়)

(খ) মহকুমা পর্যায়ে লোকাল বোর্ড

(গ) জেলা পর্যায়ে জেলা বোর্ড

এই আইনে কমপক্ষে ৯জন নির্বাচিত ও মনোনীত সদস্য নিয়ে জেলা বোর্ড গঠনের বিধান রাখা হয়। তবে আয়তন অনুযায়ী কোন কোন ক্ষেত্রে ৩৪জন পর্যন্তও সদস্য থাকার বিধান ছিল। লোকাল বোর্ডের মোট সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য নিজেদের মধ্য থেকে নতুবা বাইরে থেকে নির্বাচিত হতেন। অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ সদস্য সরকার কর্তৃক মনোনীত হতেন। জেলা বোর্ডের সদস্যগণ তাঁদের মধ্য থেকে একজনকে চেয়ারম্যান নিযুক্ত করতেন অথবা জেলা বোর্ডের সদস্যদের মধ্যে একজন সদস্য প্রাদেশিক সরকারের অনুমতি সাপেক্ষে নির্বাচিত হতেন। তবে প্রাদেশিক সরকার সরাসরিভাবে চেয়ারম্যান নিয়োগ দিতো না। ১৯৩৬ সালে লোকাল বোর্ড বিলুপ্ত হওয়ার পরে জেলা বোর্ডের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য ভোটারদের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হওয়ার বিধান রাখা হয়। ১৯৩২ সাল পর্যন্ত সদস্য পদের মেয়াদ ছিল তিন বছর। সদস্য পদের কর্মকালের মেয়াদ বৃদ্ধি করে ১৯৩২ সালে চার বছর করা হয়। এবং ১৯৩৬ সালে জেলা পরিষদের সদস্য পদের মেয়াদ ৫ বছর করা হয়েছিল। তবে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই প্রাদেশিক সরকার অসদাচরণের কারণে মোট সদস্য সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত প্রস্তাবক্রমে কোন নির্ধারিত সদস্যকে অপসারণ করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করতেন। উপরন্তু বিভাগীয় কমিশনার কতিপয় নির্দিষ্ট কারণে যে কোন সদস্যকে অপসারণ করতে পারতেন। প্রতিটি জেলা বোর্ডের একজন চেয়ারম্যান থাকতেন। তিনিই সকল নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ ও

বাস্তবায়ন করতেন। বোর্ডের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কর্মসূচী বাস্তবায়ন তথা কার্যকর করণের দায়িত্ব তার উপরে ন্যস্ত ছিলো। ১৯২০ সাল পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণ জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে পদাধিকারী থাকেন। ১৯২০ সালে জেলা বোর্ডের সদস্যগণ কর্তৃক নিজেদের মধ্য হতে চেয়ারম্যান নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। অবশ্য এ নির্বাচন প্রাদেশিক সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষ ছিল। নির্বাচিত চেয়ারম্যানের কাজে শৈথিল্য, দূর্নীতি কিংবা তার অসামর্থের কারণে প্রাদেশিক সরকার তাকে অপসারণ করে নতুন চেয়ারম্যান নিযুক্ত করতে পারতেন। চেয়ারম্যানকে সাহায্য করার জন্য একজন ভাইস-চেয়ারম্যান থাকতেন। চেয়ারম্যান বোর্ডের সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হতেন। জেলা বোর্ডের মূল কার্যাবলী ছিল প্রাথমিক শিক্ষা, পল্লী এলাকায় সড়ক, ভবন ও পুল নির্মাণ, জনস্বাস্থ্য এবং পানি সরবরাহ ও পয়:নিষ্কাশন বিষয়ক দায়িত্ব পালন করা ইত্যাদি। পথিকদের সুবিধার জন্য ডাক-বাংলো ও সরাইখানা স্থাপন, মাঝে মাঝে জেলার অভ্যন্তরে কৃষিজাত পণ্যসামগ্রী ও গবাদী-পশুর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা জেলা পরিষদ করতো। তাছাড়া দুঃস্থদের সাহায্য ও দুর্ভিক্ষের সময় ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের মতো জনসেবামূলক কার্যাদি জেলা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদন করার বিধান রাখা হয়। এই আইন অনুযায়ী জেলা পরিষদের আয়ের উৎস ছিল মূলত তিনটি। অর্থাৎ (ক) সেস, (খ) ফি এবং (গ) বিধান লঙ্ঘনের জন্য জরিমানা এবং সরকারী অনুদান।

এই আইন অনুযায়ী বেশকিছু সমস্যা বিদ্যমান ছিল। এগুলি হলো ঃ-

(১). জেলা বোর্ডের আয়ের উৎস অত্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকায় জেলা বোর্ড পর্যাপ্ত পরিমানে জনকল্যাণমূলক তথা উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে পারতো না।

(২) জেলা বোর্ডের উপরে নির্ভরশীল অধঃস্তন স্থানীয় সরকার পরিষদগুলিকে জেলা বোর্ড তেমন আর্থিক সাহায্য দিতে পারতো না।

(৩) জেলা বোর্ডের হাতে অন্যান্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলি তুলনায় বেশী মাত্রায় ক্ষমতা দেয়ায় তা অনেকটা সেচ্ছাচারী বা স্বৈরাচারী হয়ে উঠার আশঙ্কা ছিল।

(৪) জেলা বোর্ডগুলির উপরে সরকারী নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত ব্যাপক মাত্রায় ছিল। ১৯২০ সাল পর্যন্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পদাধিকার বলে জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন কালে বিস্তর ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ভোগ করতেন। আর জেলা বোর্ডের সদস্যদের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ সদস্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এর সুপারিশের দ্বারা মনোনীত হতেন। উপরন্ত সরকার বোর্ডের সিদ্ধান্ত বাতিলের ক্ষমতা সংরক্ষণ করতেন।

বঙ্গীয় পল্লী স্বায়ত্বশাসন আইন-১৯১৯

এই আইন অনুযায়ী চৌকিদারী পঞ্চায়েত.এবং ইউনিয়ন কমিটি বিলুপ্ত করে ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন বোর্ড এবং জেলা পর্যায়ে জেলা বোর্ড গঠনের বিধান করা হয়। তবে ১৮৮৫ সালে গঠিত লোকাল বোর্ড ব্যবস্থা অপরিবর্তিত রাখা হয়, যা ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত কার্যকরী থাকে।

এই আইন দ্বারা জেলা বোর্ডের গঠনগত ক্ষেত্রে কিছুটা গণতান্ত্রিক চরিত্র আনয়নের বিধান করা হয়েছিল। এই আইনের বিধান মোতাবেক জেলা বোর্ডের মোট সদস্যের

মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য নির্বাচিত হতেন, আর এক তৃতীয়াংশ সদস্য সরকার কর্তৃক মনোনীত হতেন। এই আইন অনুযায়ী জেলা বোর্ডের সদস্যরা সরাসরিভাবে নির্বাচিত সদস্যদের মধ্য থেকে চেয়ারম্যান এবং এক বা দুইজন ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত করতেন। যেসব পুরুষের বয়স ২১ বছরের বেশী এবং যাদের নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পত্তি ও শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল তারাই কেবল জেলা বোর্ডের সদস্য নির্বাচনের জন্য ভোটাধিকার প্রাপ্ত ছিলেন। জেলা বোর্ডের সদস্য মনোনয়ন প্রথা ১৯৫৬ সালে বাতিল করা হয়। জেলা বোর্ড মূলত যোগাযোগ ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য ও পয়ঃপ্রণালী, পানি সরবরাহ, জন্ম-মৃত্যু রেজিষ্ট্রীকরণ, পল্লী দাতব্য চিকিৎসালয় এবং ডাকবাংলা সংরক্ষণ এর কাজ করতো। এছাড়া স্বতন্ত্র দফতর হিসেবে শিক্ষা পরিদপ্তর সম্প্রসারিত না হওয়া পর্যন্ত জেলা বোর্ড শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতো। অন্যান্য আয়ের উৎসের সাথে ফেরী ব্যবহারের জন্য ফি আদায়ের ক্ষমতা এবং মোটরযান ট্যাক্সের অংশ সরকার থেকে দেয়ার বিধান রাখা হয়।

এই আইনের দ্বারা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলি বিশেষত জেলা পরিষদের বেশকিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেলেও এ পদ্ধতি ছিল মূলত পুরাতন পদ্ধতিরই একটি সংশোধিত রূপ। এতে নতুন কোন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসেনি। এ আইনে যে ভোটাধিকার দেয়া হয়েছিল তা ছিল সংরক্ষিত ভোটাধিকার। আবার প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচন পদ্ধতিটা গণতান্ত্রিক ছিলনা।

পাকিস্তান আমল ঃ

পাকিস্তান আমলের প্রথম দশ বছর বৃটিশদের প্রবর্তিত আইন-কানুন দ্বারাই স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালিত হয়েছে। তবে তাদের সংগঠন ও নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে বেশকিছু উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়। ১৯৫৬ সালের মার্চ মাসে পূর্ব বাংলার গভর্ণর এ, কে, ফজলুল হক এক অধ্যাদেশ জারী করেন। ফলে ১৮৮৫ সালে প্রবর্তিত জেলা বোর্ড সমূহে মনোনয়ন প্রথা রহিত করে সকল সদস্যকে ভোটারদের দ্বারা নির্বাচনের বিধান করা হয়। ১৯৫৭ সালের মে মাসে গৃহীত আইন দ্বারা ১৮৮৫ সালের আইনকে আরও সংশোধন করে জেলা বোর্ডের প্রাপ্ত বয়স্কদের (২১ বছর) ভোটাধিকারের নীতি প্রবর্তিত হয়।

মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ-১৯৫৯

পাকিস্তান স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভের এক দশক পরে ফিল্ড মার্শাল আইয়ূব খান শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। তিনি ১৯৫৯ সালে মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ জারী করে চার স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গঠনের মাধ্যমে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য ভিত্তি রচনা করেছেন বলে ব্যাপকভাবে প্রচার চালান। তাঁর প্রবর্তিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলি হলো ঃ

১। ইউনিয়ন কাউন্সিল

২। থানা কাউন্সিল

৩। জেলা কাউন্সিল

৪। বিভাগীয় কাউন্সিল।

এ আদেশ বলে জেলা কাউন্সিল মূলত সরকারী কর্মকর্তা ও মনোনীত সদস্যদের নিয়ে গঠিত হতো। জেলা কাউন্সিলের ৫০% সদস্য ইউনিয়ন কাউন্সিল ও টাউন কমিটির চেয়ারম্যানদের দ্বারা নির্বাচিত হতেন। অবশিষ্ট ৫০% সদস্য জেলা পর্যায়ে নির্দিষ্ট কতগুলি সরকারী পদে কর্মরত সরকারী কর্ম কর্তাগণের মধ্য থেকে সরকার কর্তৃক মনোনীত হতেন। জেলা প্রশাসক পদাধিকার বলে জেলা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ করতেন। তিনি জেলা কাউন্সিলের নির্বাহী প্রধান হিসেবে কাজ করতেন। তবে ১৯৬৩ সালে নির্বাচিত (অর্থাৎ বেসরকারী) প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে একজন ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচনের বিধান করা হয়। জেলা কাউন্সিলের বিদ্যমান সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে গৃহীত অনাস্থা প্রস্তাবের দ্বারা ভাইস-চেয়ারম্যান অপসারণ করা যেত। জেলা কাউন্সিলের একজন সেক্রেটারী থাকতেন। সাধারণত সিভিল সার্ভিসের লোকদেরকে এ পদে নিয়োগ করা হতো। আর সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনারগণ এই নিয়োগ দিতেন।

সড়ক, ভবনাদি, হাসপাতাল, ডিসপেনসারী, স্কুল ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য ও পয়ঃপ্রণালী, নলকূপ, ডাকবাংলা সংরক্ষণ এবং জেলার অন্তর্গত স্থানীয় পরিষদ-সমূহের কর্ম তৎপরতায় সমন্বয় সাধন করা ছিল জেলা কাউন্সিলের অন্যতম কাজ। কর, রেট, টোল, ফি ইত্যাদি ধার্যকরণ ও আদায় এবং সরকারী অনুদান ছিল জেলা কাউন্সিলের আয়ের উৎস।

মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ যেই মূল অথচ ভুল ধারণার উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়, তা ছিল এই যে, জনগণ অজ্ঞ ও পূর্ণ গণতন্ত্রের অযোগ্য। সুতরাং মাত্র ১৫জন ভোটার (যাঁরা ইউনিয়ন কাউন্সিল ও টাউন কমিটির চেয়ারম্যান) জেলা কাউন্সিলের একজন তথাকথিত নির্বাচিত সদস্যকে নির্বাচন করতেন। এ আদেশ বলে জেলা পরিষদকে গণতান্ত্রিকতার দিকে এগিয়ে নেয়া হয় বলে যে দাবী করা হয়েছিল, তা তেমন সঠিকভাবে প্রতিফলিত হতে পারেনি। কারণ জেলা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান সরকার কর্তৃক মনোনীত হওয়ায় স্থানীয় সরকার হিসেবে জেলা কাউন্সিলের স্বশাসন প্রতিষ্ঠায় যেমন বাধা ছিল তেমনিভাবে তা প্রতিষ্ঠানটির গণতান্ত্রিকতা আনতে প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করেছিল। সংগত কারণেই এ প্রতিষ্ঠানটিতে দূর্নীতি, স্বজন প্রীতি ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অভাব দেখা দেয়। সরকারী অনুদানের প্রতি অতিরিক্ত নির্ভরশীলতার ফলে আর্থিক.বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে স্বাধীনতার অভাবও এই প্রতিষ্ঠানটিকে গণতান্ত্রিকতার দিকে ধাবিত হতে বাধা দিয়েছে প্রতি পদক্ষেপে।

বাংলাদেশ আমল ঃ

বাংলাদেশের স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে দেশে কোন পার্লামেন্ট বা সংসদ না থাকায় এবং সংবিধান প্রণীত না হওয়ায় রাষ্ট্রপতির আদেশ জারীর মাধ্যমে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় কার্যকারিতা আনয়ন করা হয়। ১৯৭২ সালের ২০শে জানুয়ারী রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশ স্থানীয় পরিষদ ও পৌর কমিটি (বাতিল ও শাসন) আদেশ-১৯৭২ অর্থাৎ রাষ্ট্রপতির আদেশ নম্বর-৭ (পি ও-৭) জারীর মাধ্যমে পূর্বের প্রবর্তিত মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ বলে সৃষ্ট সবকটি সংস্থাকে ভেঙ্গে দিয়ে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার

সব কটি স্তরে প্রশাসক নিয়োগ করা হয়। ইউনিয়ন কাউন্সিলের নাম বদল করে ইউনিয়ন পঞ্চায়েত রাখা হয়। থানা কাউন্সিলের নাম বদল করে থানা উন্নয়ন কমিটি এবং জেলা কাউন্সিলের নাম বদল করে জেলা বোর্ড রাখা হয়।

রাষ্ট্রপতির আদেশ নং-২২, ১৯৭৩ ঃ

এ আদেশ জারীর মাধ্যমে ইউনিয়ন পঞ্চায়েতের নাম পরিবর্তন করে ইউনিয়ন পরিষদ নামকরণ করা হয়। প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ তিনটি ওয়ার্ডে বিভক্তির মাধ্যমে তিনজন করে মোট ৯জন সদস্য নির্বাচনের বিধান করা হয়। সমগ্র ইউনিয়নের জন্য একজন চেয়ারম্যান এবং একজন ভাইস-চেয়ারম্যান প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচনের বিধান রাখা হয়। জেলা বোর্ডের ক্ষেত্রে কোনরূপ পরিবর্তন এই আইনে আনয়ন করা হয়নি।

স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ-১৯৭৬ ঃ

১৯৭৬ সালের ২২শে নভেম্বর স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ জারী করা হয়। এ অধ্যাদেশ দ্বারা ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদ, থানা পর্যায়ে থানা পরিষদ এবং জেলা পর্যায়ে জেলা পরিষদ এই তিন স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গঠন করা হয়।

এই অধ্যাদেশ অনুযায়ী নির্বাচিত সরকারী ও মনোনীত মহিলা সদস্যদের সমন্বয়ে জেলা পরিষদ গঠিত হতো। তবে মহিলা মনোনীত সদস্যদের সংখ্যা নির্বাচিত সদস্যদের চেয়ে কোন অংশেই কম হতো না। নির্বাচিত ও মনোনীত সদস্যদের মোট সংখ্যার কমপক্ষে এক-দশমাংশ মহিলা সদস্যদের মধ্য থেকে একজন চেয়ারম্যান এবং একজন ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার বিধান রাখা হয়। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এ অধ্যাদেশ জারী হওয়ার পরে জেলা পরিষদের কোন নির্বাচন দীর্ঘদিন অনুষ্ঠিত হয়নি। এই আইনে জেলা পরিষদের দায়িত্ব ছিল পাঠাগার, হাসপাতাল ও ডিসপেনসারী, সরকারী সড়ক, কালভার্ট, পুল, সরকারী বাগান, খেলার মাঠ, ডাকবাংলা ইত্যাদি নির্মাণ, সংরক্ষণ/সংস্কার করা। তাছাড়া স্বেচ্ছায় কল্যাণমূলক কাজ, সাংস্কৃতিক, জনশিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, গণপূর্ত ও অন্যান্য কার্যাবলী জেলা পরিষদের দ্বারা সম্পাদনের বিধান রাখা হয়।

স্থানীয় সরকার জেলা পরিষদ আইন-১৯৮৮ ঃ

১৯৮৮ সালের ৪ঠা জুন তারিখে স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) আইন পাশ হবার পরে বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় এই আইনের বিধান অনুযায়ী একটি করে জেলা পরিষদ স্থাপিত হয় এবং সংশ্লিষ্ট জেলার নামে জেলা পরিষদটি পরিচালিত হবে মর্মে উল্লিখিত হয়। এই আইন পাশের আগে পূর্ববর্তী আইন অর্থাৎ ১৯৭৬ সালের স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ এর ৯৭(২) (।।) ধারার বিধান অনুযায়ী পূর্বতন জেলাগুলিতে (পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাড়া) জেলা প্রশাসকগণই জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ করে যেতেন। এই আইনটি পাশ হবার পরে জেলা পরিষদ একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থার মর্যাদা পায়। জেলা পরিষদের স্থানীয় ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকবে। আইন ও তদধীনে প্রণীত বিধি সাপেক্ষে স্থাবর ও অস্থাবর উভয়

প্রকার সম্পত্তি অর্জন করার, অধিকারে রাখার ও হস্তান্তর করার ক্ষমতা থাকবে ও পরিষদের নামে মামলা দায়ের করতে পারবে বা বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাবে। প্রতিনিধি সদস্য, মনোনীত সদস্য, মহিলা সদস্য ও কর্মকর্তা সদস্য সমন্বয়ে জেলা পরিষদ গঠিত হয়েছে। জেলার সংসদ সদস্যগণ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা-সমূহের চেয়ারম্যানগণ পদাধিকার বলে জেলা পরিষদের প্রতিনিধি সদস্য হবে বলে উক্ত আইনে বিধান রাখা হয়। উল্লেখযোগ্য যে, জেলা পরিষদের কর্মকর্তা (অর্থাৎ অফিসিয়াল) সদস্যদের ভোট প্রদানের ক্ষমতা ছিলনা।

এই আইনের প্রথম তফসীলের বিধান মোতাবেক জেলা পরিষদের দুই ধরনের কার্যাবলী সম্পাদনের ব্যবস্থা রাখা হয়। এগলি হলো (১) আবশ্যিক (২) ঐচ্ছিক। আবশ্যিক কার্যাবলী ছিল মোট বারোটি যা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছিল। এগুলি হলোঃ জেলার মধ্যে সকল উন্নয়ন উদ্যোগের পুনরীক্ষণ, উপজেলাকে সহায়তা, সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদান এবং উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়নের পর্যালোচনা ও হিসাব নিরীক্ষা, উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভাসমূহ বা সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত নয় এরূপ জনপথ, কালভার্ট ও ব্রীজ নির্মাণ, সরাইখানা নির্মাণ, ডাকবাংলা, বিশ্রামাগার, উদ্যান, খেলার মাঠ ও উন্মুক্ত স্থানের ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং জেলা পরিষদের অনুরূপ কার্যাবলী সম্পাদনরত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সহযোগিতা করা ইত্যাদি। আর ঐচ্ছিক কার্যাবলীর মধ্যে আছে শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজকল্যাণ, অর্থনৈতিক ও জনস্বাস্থ্য, গণপূর্ত বিষয়ক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং স্থানীয় এলাকা ও এলাকাবাসীদের ধর্মীয়, নৈতিক ও বৈষয়িক উন্নতি সাধনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ। উল্লেখযোগ্য বিষয়টি হলো এই যে, জেলা পরিষদ তার তহবিলের সংগতির উপরে ভিত্তি করে সরকারী নির্দেশ বা সংশ্লিষ্ট বিধি অনুযায়ী আবশ্যিক কার্যাবলী সম্পাদন করবে। আর ইচ্ছা করলে বা সরকারী নির্দেশ অনুযায়ী জেলা পরিষদ ঐচ্ছিক কার্যাবলী সম্পাদন করতে পারবে। তাছাড়া সরকারের পূর্বানুমোদন নিয়ে জেলা পরিষদ যে কোন বাণিজ্যিক কার্যক্রম বা প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনা করতে পারে। তবে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা প্রদান, তহবিলের উপরে দায় মুক্ত ব্যয়, দায়িত্ব সম্পাদন এবং কর্তব্য পালনের জন্য ব্যয় অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে করতে হবে।

দ্বিতীয় তফসিলের বর্ণনানুযায়ী জেলা পরিষদ সরকারের অনুমোদনক্রমে ৮(আট)টি উৎস হতে নিজস্ব আয়ের ব্যবস্থা করতে পারবে ঃ (১) স্থাবর সম্পত্তির উপরে ধার্য অংশ (২) বিজ্ঞাপনের উপরে কর (৩) জেলা পরিষদের রক্ষণাবেক্ষণাধীন রাস্তা, পুল ও কালভার্ট অথবা ফেরীর উপরে টোল (৪) জেলা পরিষদ স্থাপিত বা পরিচালিত স্কুলের ফিস (৫) জেলা পরিষদ কর্তৃক জনকল্যাণমূলককাজ সম্পাদনের জন্য রেট (৬) জেলা পরিষদ কর্তৃক কৃত জনকল্যাণমূলক কাজ হতে প্রাপ্ত উপকার গ্রহণের জন্য ফিস (৭) জেলা পরিষদ কর্তৃক কোন বিশেষ সেবার জন্য ফিস এবং (৮) সরকার কর্তৃক পরিষদকে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আরোপিত কোন কর।

এই আইন বলে জেলা পরিষদের জন্য সরকার কর্তৃক একজন চেয়ারম্যান তিন বছরের জন্য মনোনয়নের মাধ্যমে নিয়োজিত করার বিধান রাখা হয়। এই আইনের আওতায় প্রথমবারের মতো সরকারী দলের সংসদ সদস্যদেরকে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। তবে ১৯৯০ সালের পর হতে অদ্যাবধি আর কোন চেয়ারম্যান নিয়োগ দেয়া হয়নি বা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হয়নি।

এই আইনের অধীনে যাবতীয় কার্যাবলী যথাযথভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু করার ক্ষমতা জেলা পরিষদের থাকবে। জেলা পরিষদের নির্বাহী ক্ষমতা চেয়ারম্যানের উপরে ন্যস্ত হবে এবং এই আইন ও বিধি অনুযায়ী চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে অথবা তার নিকট হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্যকোন ব্যক্তির মাধ্যমে যুক্ত হবে। জেলা পরিষদের নির্বাহী বা অন্যকোন কার্য জেলা পরিষদের নামে গৃহীত হয়েছে বলে প্রকাশ করা হবে এবং উহা বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রমাণীকৃত হতে হবে। জেলা পরিষদের সকল সভায় চেয়ারম্যান, এবং তার অনুপস্থিতিতে সভায় উপস্থিত সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত অন্য কোন সদস্য সভাপতিত্ব করবেন। জেলা পরিষদের প্রত্যেক সভার কার্যবিবরণী একটি বইতে লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং এর একটি করে অনুলিপি সভা অনুষ্ঠিত হবার তারিখের ১৪ দিনের মধ্যে বিভাগীয় কমিশনার এবং সরকারের নিকট প্রেরণ করতে হবে।

জেলা পরিষদ তার কাজের সহায়তার জন্য প্রয়োজনবোধে কমিটি নিয়োগ করতে পারবে এবং উক্তরূপে কমিটির সদস্য সংখ্যা ও এর দায়িত্ব এবং কার্যধারা নির্ধারণ করতে পারবে।

প্রতি অর্থ বছরের শুরুতে জেলা পরিষদ উক্ত বছরের সম্ভাব্য আয় ও ব্যয় সম্বলিত বিবরণী, অতঃপর বাজেট বলে উল্লিখিত, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রণয়ন ও অনুমোদন করবে এবং তার একটি অনুলিপি বিভাগীয় কমিশনার ও সরকারে নিকট প্রেরণ করবে। কোন অর্থ বছরের শুরু হওয়ার আগে কোন জেলা পরিষদ তার বাজেট অনুমোদন করতে না পারলে, সরকার উক্ত বছরের জন্য একটি আয়-ব্যয় বিবরণী প্রস্তুত করে তা প্রত্যয়ন করবে এবং এরূপ প্রত্যয়নকৃত বিবরণী জেলা পরিষদের বাজেট বলে গণ্য হবে। অবশ্য বাজেটের অনুলিপি প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে সরকারী আদেশ দ্বারা অনুরূপ সংশোধিত বাজেটই জেলা পরিষদের অনুমোদিত বাজেট বলে গণ্য হবে। কোন অর্থ বছর শেষ হওয়ার আগে যে কোন সময় সেই অর্থ বছরের জন্য, প্রয়োজন হলে, একটি সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন করা যাবে এবং উক্ত সংশোধিত বাজেটের ক্ষেত্রেও এই ধারার বিধানাবলী যতদুর সম্ভব প্রযোজ্য হবে। প্রতিটি জেলা পরিষদের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও ফরমে সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি অর্থ বছর শেষ হওয়ার পরে জেলা পরিষদ একটি বার্ষিক আয় ও ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত করবে এবং পরবর্তী ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে তা সরকারের নিকট প্রেরণ করবে। উক্ত বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসেবের একটি অনুলিপি জনসাধারণের পরিদর্শনের জন্য জেলা পরিষদ কার্যালয়ে প্রকাশ্যে লটকিয়ে রাখতে হবে। উক্ত হিসাব সম্পর্কিত জনসাধারণের আপত্তি বা পরামর্শ জেলা পরিষদ বিবেচনা করবে। প্রতিটি জেলা পরিষদের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও বিধি দ্বারা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ দ্বারা নিরীক্ষিত হবে।

১৯৯০ সালের পরে জেলা পরিষদের গঠন ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়। জাতীয় সংসদের সদস্যের স্থলে জেলা প্রশাসক পদাধিকারবলে চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন।

১৯৯১ সালে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত সরকার পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে স্থানীয় সরকার কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশনের ইউনিয়ন পরিষদ ও জেলা পরিষদ এই দুই স্তরে স্থানীয় সরকার পদ্ধতি গঠনের সুপারিশের ভিত্তিতে এই দুই স্তরের স্থানীয় সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদ কার্যকর হলেও জেলা পরিষদ অকার্যকর থাকে এবং বর্তমানে এর অস্তিত্ব কোন রকমে টিকে আছে বলা যেতে পারে। বর্তমানে জেলা পরিষদের সার্বিক কাজকর্ম সম্পাদনের জন্য একজন জ্যেষ্ঠ সিনিয়র সহকারী সচিবকে জেলা পরিষদের সচিব নিয়োজিত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। নিজস্ব আয়ের মধ্যে স্থাবর সম্পত্তির হস্তান্তর খাতে আয় সম্প্রতি শতকরা ২(দুই) ভাগ থেকে ১(এক) ভাগে হ্রাস করে বাকী ১ (এক) ভাগ ইউনিয়ন পরিষদকে দেয়া হয়েছে বিশ্ব ব্যাংকের প্রদত্ত শর্তানুযায়ী।

বর্তমানে যে সব স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান আছে তার মধ্যে পুরাতন ও ঐতিহ্যময় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে জেলা পরিষদের পুনরুজ্জীবন অত্যাবশ্যকীয়। গণতন্ত্রায়ন, প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণ এবং সুশাসনের জন্য জেলা পরিষদকে পুনর্গঠিত করে তার যথাযোগ্য মর্যাদা এবং যথোপযুক্ত ক্ষমতা দেয়া হলে সরকারের অনেক দায়িত্ব ও কার্যক্রম আরও সুচারূপে সম্পন্ন করার পথ পাবে। নবতর বিন্যাসে জেলা পরিষদকে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার শক্তিশালীকরণের অন্যতম প্রধান পদক্ষেপ হিসেবে দেখা যেতে পারে।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ১৮৮৫ সালে সৃষ্ট জেলা পরিষদ ক্রমান্বয়ে একটি শক্তিশালী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে থাকে এবং বৃটিশ আমলের শেষ দিকে এসে এই প্রতিষ্ঠানটি মোটামুটি প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিকশিত হয়। ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানটি মোটামুটি প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠান হিসেবেই পরিচালিত হচ্ছিল। ১৯৫৯ সালে মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ বলে জেলা কাউন্সিল গঠনের মাধ্যমে জেলা পরিষদকে গণতান্ত্রিক চরিত্র প্রদান করা হয়েছিল বলে মৌলিক গণতন্ত্রের ব্যাপক প্রচার চালালেও প্রকৃতপক্ষে এই ব্যবস্থায় জেলা পরিষদের গণতান্ত্রিক চরিত্র বিকশিত হয়নি। বরং উল্টোভাবে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে সরকারী কর্মকর্তাকে মনোনয়ন দেয়ার মাধ্যমে এবং ৫০% সদস্যকে জেলা পরিষদের সদস্য হিসেবে মনোনয়নের বিধান রাখায় জেলা পরিষদ আসলে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিকশিত হওয়ার কাঠামোগত বাধাই শুধুই পায়নি বরং তা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিকশিত হতে পারেনি। তাছাড়া এই বিধান অনুযায়ী আর্থিক বিষয়ে জনপ্রতিনিধিগণের কোন সিদ্ধান্ত নেয়া বা অর্থ ব্যয় করার ক্ষেত্রে তেমন কোন ক্ষমতা ছিলনা।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে ১৯৭২ সালে পি ও জারীর মাধ্যমে জেলা কাউন্সিল এর নাম পরিবর্তন করে জেলা বোর্ড রাখা হয়। এর পরে ১৯৭৬ সালের ২২শে নভেম্বর স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ জারী করে নির্বাচিত সদস্যদের মধ্য থেকে একজন জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এবং একজন ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচনের বিধান রাখা হয়। আর

জেলা পরিষদের সদস্যদের প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটারদের ভোটে সরাসরিভাবে নির্বাচিত হওয়ার বিধান রাখা হয়। কিন্তু এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি দীর্ঘদিন ধরে। প্রকৃতপক্ষে জেলা প্রশাসক জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ করতেন। ১৯৮৮ সালে স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) আইন পাশ হবার পরে জেলা পরিষদ একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থায় পরিণত হয় তাত্ত্বিকভাবে। জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে সংসদ সদস্যকে মনোনয়ন দানের বিধান মোতাবেক একবার জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মনোনীত করা হয়েছিল। কিন্তু তাও আবার পরবর্তী এক সংশোধনী মোতাবেক স্থগিত করা হয়। একজন সিনিয়র সহকারী সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাকে জেলা পরিষদের সচিব হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়, যিনি কিনা বর্তমানে জেলা পরিষদের সার্বিক কর্মকান্ডই পরিচালনা করে আসছেন। অর্থাৎ জেলা পরিষদ তাত্ত্বিকভাবে একটি প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিভাত হলেও বাস্তবে তা সরকার নিয়ন্ত্রিত একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিকশিত হয়েছে। কারণ এই প্রতিষ্ঠানটি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি দ্বারা সামান্য সময় ছাড়া কখনোই পরিচালিত হওয়ার সুযোগ পায়নি।

অথচ জেলা পরিষদ-এর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে অত্যন্ত শক্তিশালী ও সক্রিয় প্রতিষ্ঠানরূপে বিকশিত হওয়া দরকার ছিল।

জেলা পরিষদের সম্ভাব্য ভবিষ্যত রূপরেখা ঃ

যে কোন প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যত রূপরেখা কেমন হবে বা কেমন হওয়া উচিৎ তা অনুমান করাটা সহজতর হলেও বাস্তবে এর রূপায়ন সর্বক্ষেত্রে আশানুরূপ হয়না। কারণ প্রায়ই তত্ত্ব ও বাস্তবতার মধ্যে পার্থক্য দেখা দেয়। আবার যে কোন তত্ত্ব বাস্তবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে বা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তত্ত্বের থেকে বেশ কিছুটা পার্থক্যশীল হয়ে ওঠে। তাছাড়া পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রভাবে প্রায়ই কোন তত্ত্ব বাস্তবায়নের সময় তাত্ত্বিক প্রতিকল্প থেকে পার্থক্যশীল হয়ে পড়ে। তাই এসব বিষয়ের প্রতি খেয়াল রেখে জেলা পরিষদের ভবিষ্যত রূপরেখা কেমন হওয়া উচিৎ সে বিষয়ে আলোকপাত করলে ভাল হবে। এদেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের রূপরেখা কেমন হওয়া উচিৎ এ ব্যাপারে সম্প্রতি গঠিত স্থানীয় সরকার কমিশন যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করে বিস্তারিত প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করে আইনে পরিণত করেছে। উক্ত প্রতিবেদনের আলোকে ইউনিয়ন পরিষদ এবং গ্রাম পরিষদ সম্বন্ধে বিলের খসড়া সংসদে উপস্থাপিত হয়েছে। কিন্তু জেলা পরিষদ-এর ভবিষ্যত রূপরেখা সংক্রান্ত কোন প্রস্তাব এখনও বিলের খসড়া আকারে সংসদে উপস্থাপিত না হওয়ায় এর ভবিষ্যৎ রূপরেখা সম্বন্ধে অনুমান করা বেশ অসুবিধাজনক। তবুও জেলা পর্যায়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে জেলা পরিষদের ভবিষৎ রূপরেখা সম্বন্ধে নিম্নে আলোকপাত করা হলো ঃ

জেলা পরিষদের গঠন ঃ

১। জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জেলার প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে সরাসরিভাবে নির্বাচিত হবেন।

২। যদি আর্থিক সংশ্লেষ বা অন্যান্য জটিলতার কারণে সম্ভব না হয়, তবে ইলেক্টরাল কলেজের মাধ্যমে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের নির্বাচনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৩। জেলার প্রতি থানা থেকে দুইজন সদস্য জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন।

৪। মোট সদস্যের অতিরিক্ত এক-তৃতীয়াংশ মহিলা (সংরক্ষিত আসনে) সদস্য জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন।

৫। সংশ্লিষ্ট জেলার আওতাভুক্ত উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানগণ এবং পৌরসভার চেয়ারম্যানগণ পদাধিকারবলে জেলা পরিষদের সদস্য হবেন।

৬। জেলা পর্যায়ের সকল সরকারী কর্মকর্তা পদাধিকারবলে জেলা পরিষদের সদস্য হবেন। তবে বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাগণকে এই পরিষদের সদস্য না করলে ভাল হবে।

৭। জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের পদ-মর্যাদা প্রতিমন্ত্রী সমতুল্য হলে ভাল হয়।

৮। জেলার মাননীয় সংসদ সদস্যগণ সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদের উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করবেন।

৯। বিচারের কোর্ট ও বিচারকবৃন্দ ব্যতীত জেলা পর্যায়ে পুলিশসহ সকল সরকারী দপ্তর জেলা পরিষদের নিকট অর্পিত হবে। এসব দপ্তরের সরকারী কর্মকর্তাদের জেলা পরিষদে প্রেষণে দেয়া হয়েছে বলে গণ্য হবে এবং তারা জেলা পরিষদের তত্ত্বাবধানে কাজ করবে। তাদের ACR দপ্তরের উচ্চতর কর্মকর্তাগণ লিখবেন। আর তাদের কাজের উপরে Performance Report জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান দ্বারা লিখিত হবে।

জেলা পরিষদ নিম্নলিখিত কার্যাবলী সম্পাদন করবে ঃ

১। এ যাবৎ কালে প্রণীত আইন/বিধি মোতাবেক জেলা পরিষদ যে সব কাজ করে যাচ্ছে জেলা পরিষদ সে সব কাজ করবে।

২। থানা পরিষদসমূহের কার্যক্রমের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ (মনিটরিং) করা।

৩। জেলার সবকটি থানার উন্নয়নের সম্ভাবনা, প্রয়োজনের ভিত্তিতে একটি জেলা পরিকল্পনা তৈরী এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তর দ্বারা নিজ নিজ অধিক্ষেত্রের অধীনস্থ অফিসের মাধ্যমে স্ব-স্ব উন্নয়ন কর্মসূচীর বাস্তবায়ন এবং সমন্বয় সাধন করা।

৪। জেলা পর্যায়ে অবস্থিত কলেজ ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম তদারকী ও মনিটরিং করা।

৫। জেলার অন্তর্গত সংযোগ-সড়ক, সেতু/কালভার্ট নির্মাণের প্রস্তাব তৈরী করে জেলা পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করে সংশ্লিষ্ট বিভাগে বাস্তবায়নের জন্য প্রেরণ করা।

৬। জেলা পর্যায়ে অবস্থিত সরকারী হাসপাতাল, পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক ইত্যাদির কার্যক্রম তদারকী ও মনিটরিং করা।

৭। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা।

৮। শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার লাভে সহায়তা প্রদানে এবং ক্ষেত্র বিশেষে সরাসরি বিনিয়োগসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ।

৯। জেলার সার্বিক আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন সাধনে সহায়তা প্রদান, সন্ত্রাস প্রতিরোধ সুপারিশমালা প্রণয়ন এবং পুলিশের কাজের তদারকী করা।

স্থায়ী কমিটি সমূহের গঠন ঃ

জেলা পরিষদের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন এবং কার্যক্রমের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত কমিটিগুলি গঠন করা হবে। জেলা পরিষদের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন এবং কার্যক্রমের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত কমিটিগুলি গঠন করা হবে। জেলা পরিষদের একজন সদস্য বা সদস্যা এসব স্থায়ী কমিটির সভাপতি হবেন।

১। আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক কমিটি

২। গণপূর্ত, সড়ক ও জনপথ, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ও ফ্যাসিলিটিজ সংক্রান্ত কমিটি।

৩। স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, পানীয়জল ও স্যানিটেশন কমিটি।

৪। সমাজকল্যাণ ও মহিলা বিষয়ক, যুব উন্নয়ন এবং ক্রীড়া বিষয়ক কমিটি।

৫। কৃষি, সেচ, সমবায়, মৎস ও পশুপালন বিষয়ক কমিটি।

৬। শিক্ষা বিষয়ক কমিটি।

৭। ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, এনজিও কার্যক্রম ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচী সংক্রান্ত কমিটি।

এসব কমিটি ছাড়াও প্রয়োজনবোধে আরও কমিটি গঠিত হতে পারে। উপর্যুক্ত কমিটিগুলি পুনর্বিন্যস্ত হতে পারে প্রয়োজন অনুযায়ী।

আর্থিক ক্ষমতা বা আয়ের উৎস ঃ

১৯৮৮ সালে প্রণীত জেলা পরিষদ আইনে প্রদত্ত আর্থিক ক্ষমতাসমূহ বহাল রাখা যেতে পারে। ঐ আইনে নির্ধারিত খাতে কর, সেস, টোল আদায়ের ক্ষমতাসমূহ বহাল রাখা যেতে পারে। আর আয়ের উৎসসমূহ থেকে যাতে জেলা পরিষদ আয় করতে পারে সেজন্য যথাযথভাবে উদ্যোগ, প্রচেষ্টা ও আইনগত সমর্থন রাখা যেতে পারে। তাছাড়া বর্তমানে জেলা পরিষদকে প্রদত্ত স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর খাতের আয়ের ১% প্রদানের বিষয়টি বহাল রেখে ভূমি রাজস্ব আয়ের ৫% জেলা পরিষদকে প্রদান করা যেতে পারে। জেলা পরিষদের নিজস্ব হাট-বাজার, ফেরীঘাট এবং জলমহাল ব্যতীত সাত লক্ষ টাকার উর্ধ্বে হাট-বাজার, তিন লক্ষ টাকার উর্ধ্বে ফেরী

ঘাট, আন্তঃ থানা ফেরীঘাট (যে কোন মূল্যমানের) এবং তিনলক্ষ টাকার উর্ধ্বে জল মহালের ইজারা এবং ইজারালব্ধ আয় জেলা পরিষদের অনুকূলে দেয়া যেতে পারে। তবে আয় ব্যয়ের পদ্ধতি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রণীত বিধিমালা অনুযায়ী সম্পন্ন হতে পারে। প্রতি অর্থ বছরের শুরুতে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বাজেট নির্দেশিকা অনুযায়ী বাজেট প্রণীত হবে। সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বাজেট ছকের থেকে বিচ্যুতি হলে কর্তৃপক্ষ সে সব সংশোধনের অধিকার সংরক্ষণ করবে। আবার জেলা পরিষদ উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশিকা অনুসরণ করবে। জেলা পরিষদ স্ব-স্ব আয়-ব্যয়ের হিসেব যথাযথভাবে সংরক্ষণ করবে। বছর শেষে আয়-ব্যয়ের হিসেব আভ্যন্তরীণ এবং কেন্দ্রীয় সরকারে অডিট কর্তৃপক্ষ দ্বারা অডিট করা হবে। আর জেলা পরিষদ অডিট নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নিবে এবং অডিট প্রতিবেদন বা সুপারিশের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

উপসংহার

উপরের আলোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে জেলা পরিষদ প্রাচীনতম। প্রাচীনতম স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে জেলা পরিষদের কার্যকারিতা নিয়ে যতই বিতর্ক করা হোক না কেন নিরপেক্ষ বিশ্লেষণে জেলা পরিষদের গুরুত্বকে স্বীকার করতেই হবে। সংবিধানের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিটি প্রশাসনিক ইউনিটে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বিকাশ প্রক্রিয়া জেলা পরিষদের অবস্থান বা গুরুত্বকে সর্বাগ্রে উপলব্ধি করতে হবে। জেলা আজকে প্রশাসনিক ইউনিটের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বিবেচিত হয়। আর প্রশাসনের প্রতিটি স্তরে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বিকাশ সাধনের জন্য সাংবিধানিক নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করতে হলে জেলা পরিষদকে শক্তিশালী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে তোলা প্রয়োজন। বর্তমানে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে জেলা পরিষদের আরও কার্যকর এবং জোরালো ভূমিকা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে আরও সক্রিয় এবং শক্তিশালী করা সম্ভব বলে অনেকে মনে করেন। গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের শক্তিশালীকরণের প্রচেষ্টা এদেশে যুগ যুগ ধরে চালানো হয়েছে। কিন্তু বাস্তবিক বিশ্লেষণে দেখা যাবে যে, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের শক্তিশালীকরণের যে দাবী বা প্রচারণা এ যাবৎ কাল চলেছে তা অনেকটাই ছিল অতিরঞ্জিত।

অন্য কথায় বলা যায় যে, অনেক রাজনৈতিক নেতৃত্বই স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালীকরণের জন্য জোর প্রচেষ্টা চালালেও বাস্তবে তারা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলিকে শক্তিশালী বা সম্পূর্ণ স্বায়ত্বশাসিত এবং স্বকীয় ধারায় বিকাশযোগ্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে সক্ষম হননি। ফলে এদেশে গণতন্ত্রের বিকাশ সম্বন্ধে যতই হৈ চৈ বা প্রচারণা চালানো হোক না কেন, গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি লাভ করতে পারেনি বা সমাজে গণতান্ত্রিকতা প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেনি। এমতাবস্থায় আশা করা যায় যে, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে কেন্দ্র বিন্দু

হিসেবে বিবেচিত জেলা পরিষদসমূহকে যদি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিকশিত করা যায় তবে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশের পথ সুগম হবে। আর এরই সূত্র বেয়ে সমাজের সার্বিক কল্যাণ ও অগ্রগতি সাধিত হবে উত্তরোত্তর প্রক্রিয়ায়।

গ্রন্থপঞ্জি

০১। বাংলাদেশ সরকার, আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান*, গভর্ণমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা।

০২। *রাষ্ট্রপতি আদেশ নং ৭, ১৯৭২।*

০৩। *রাষ্ট্রপতি আদেশ নং ২২, ১৯৭৩।*

০৪। *স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ*, ১৯৭৬। বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়: ঢাকা, ১৯৭৬।

০৫। *স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) আইন*, ১৯৮৮, বাংলাদেশ সরকার মুদ্রণালয়, ঢাকা, ১৯৮৮।

০৬। পূর্ব পাকিস্তান সরকার, আইন মন্ত্রণালয়, *মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ*, ১৯৫৯, ইপিজি প্রেস, ঢাকা, ১৯৬৬।

০৭। Government of Bengal (Legislative Department). *The Village Chowkidari Act. 1870*. BG Press. Alipore. 1890.

০৮। Government of East Bengal (Legislative Department). *The Bengal Self Government Act*. 1919. BT Press. Alipore. 1991.

০৯। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। *প্রতিবেদন, স্থানীয় সরকার কাঠামো পর্যালোচনা কমিশন।* স্থানীয় সরকার কাঠামো পর্যালোচনা কমিশন, ঢাকা, ১৯৯২।

১০। Siddiqui Kamal. *Local Government in Bangladesh*. University Press Limited. Dhaka. 1994.

১১। Ahmed. Ali. *Administration of Local Government for Rural Areas in Bangladesh*. LGI Dhaka.

১২। Alam. Bilquis Ara. *The Ordinances of Rural Local Bodies* (with up to date amendments). National Institute of Local Government. Dhaka 1986.

১৩। Rahman. A. T. and Rahman. S. *Local Government in Bangladesh : An Agenda for Governance. Division of Public Administration and Development.* Department of Development and Management Servies. UNDP. New York. 1996.

১৪। Ahmed. Syed Gias Uddin. *Local Government : A Typology of Development Administration*. Dhaka University Studies XXIII (Part A).

১৫। হক, আবুল ফজল, *বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪।

১৬। Ali AMM. Showkat. *Field Administration & Rural Development in Bangladesh*. Dhaka. CSS-1982

১৭। Ali Shaik Maqsood et al. *Decentralization and People's Participation in Bangladesh*. Dhaka. NIPA. 1983.

১৮। Alam Manjur-ul. *Leadership Pattern. Problemes and Prospects of Local Government in Rural Bangladesh*. Comilla. BARD. 1976.

লোক প্রশাসন সাময়িকী
৯ম সংখ্যা, জুন ৯৭, আষাঢ় ১৪০৪

লোক-প্রশাসনে দক্ষতা ঃ একটি পর্যবেক্ষণমূলক আলোচনা

এ, কে, এম, মতিউর রহমান *
মোঃ জাহিদুর রহমান

ভূমিকা

"এমনকি কয়েক দশক আগেও রাষ্ট্রীয় সেবা পাওয়া যেতো কোন প্রকার ঘুষ না দিয়ে বা প্রভাব না খাটিয়ে। কিন্তু এখন কেন এটা সম্ভব নয়? কি জন্য এটা হচ্ছে? কোন ব্যবস্থা এটাকে রক্ষা করছে, আইন, বিচার না প্রশাসনিক ব্যবস্থা? জনগণের অর্থে পরিচালিত এই প্রশাসন কার স্বার্থে চলছে?" এ কথাগুলো বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, ২৪শে জুন, ১৯৯৬ তারিখে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক ভাষণে।

"জনকেন্দ্রিক, জবাবদিহি, স্বচ্ছ এবং কার্যকর সিভিল প্রশাসন গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রশাসনিক ব্যবস্থার এবং কাঠামোর প্রতিটি পর্যায়ে সংস্কার হওয়া প্রয়োজন। প্রশাসনকে হতে হবে জবাবদিহিমূলক দায়িত্বশীল এবং দক্ষ।" এডাব এর পক্ষ থেকে এ কথাগুলো বলা হয়েছে (গ্রাসরুট)।

জাতিসংঘের এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, "বাংলাদেশ সরকারের কার্যকারিতা সম্পর্কে বিভিন্ন মহল বেশ উদ্বিগ্ন। এমন একটি উপলব্ধি এসেছে যে জবাবদিহির উপায় এবং প্রতিষ্ঠানগুলো যেমন যথেষ্ট স্বচ্ছ নয়, ঠিক তেমনিভাবে কার্যকর, নিরপেক্ষ ও দক্ষ নীতি এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পর্যাপ্ত নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করতে পারছেনা।"

দেশের প্রধানমন্ত্রী, বেসরকারী সংস্থার প্রতিনিধি এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার এরূপ মন্তব্য থেকে একটি কথাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তা হলো প্রশাসনে দক্ষতার অভাব সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডকে ব্যাহত করছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, প্রশাসনে কেন এই অদক্ষতা? কিভাবে একে দক্ষ ও গতিশীল করা যায়? যা হোক, উপমহাদেশের সিভিল সার্ভিস সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা লাভের জন্য এর কিছুটা ইতিহাস পর্যালোচনা করা দরকার।

উপমহাদেশে সিভিল সার্ভিস

ভারতবর্ষ উপমহাদেশে সিভিল সার্ভিসের বিশেষত নির্বাহী কর্মকর্তাদের যে পেশাগত মূল্যবোধের প্রকাশ দেখা যায়; তা "ক্লাসিক্যল জেনারেলিজম" বা "ধ্রুপদী

---

* অষ্টাদশ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পাঠক্রমের প্রশিক্ষণার্থীদ্বয়, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

সাধারণবাদ" অথবা "অভিভাবকত্ব মূলক" যা তত্ত্বগতভাবে কনফুসিয়স ও প্লেটোর দর্শনের আওতায় পড়ে। ম্যাক্সওয়েবার চৈনিক মান্ডরিনেট বা নির্বাহী কর্মকর্তা শ্রেণীকে বিদগ্ধজন হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন। কেউ কেউ সেজন্য ভারতবর্ষ উপমহাদেশের সিভিল সার্ভিস সমূহে যে "ধ্রুপদী সাধারণবাদ" লক্ষ্য করা যায় তার উৎস খুঁজেছেন চৈনিক সিষ্টেমে। এ সিষ্টেমে গুরুত্ব দেয়া থাকে পরীক্ষিত মেধাসম্পন্ন মানবিক শাস্ত্রসমূহে বুৎপত্তি রয়েছে এমন সব তরুণদের, যারা রাষ্ট্রের সেবায় জীবন নিবেদন করবেন।

এ ঐতিহ্য উপমহাদেশের সিভিল সার্ভিসের বিকাশের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মাঝে নিহিত রয়েছে। এ দেশের আধুনিক সিভিল সার্ভিসের বিকাশের ধারাটি যার যাত্রা ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবসায়িক পর্যায় থেকে শুরু। ব্যবসামূলক পর্যায়ের শুরুতে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সিভিল সার্ভিসকে বলা হতো "মাননীয় কোম্পানীর সিভিল সার্ভিস"। এ সার্ভিসের অধীন কর্মকর্তাবৃন্দ প্রকৃতপক্ষে ছিল বাণিজ্যিক এজেন্ট। ওয়ারেন হেষ্টিংসের আমল থেকেই কোম্পানীর সিভিল সার্ভিস শুধুমাত্র বাণিজ্য ক্ষেত্রে কর্মকান্ড পরিচালনা করা ছাড়াও বৃহত্তর চৌহদ্দিতে বেরিয়ে আসতে শুরু করে। ইংল্যান্ডের সরকারী কর্মকান্ড পরিচালনা করার নীতির ভিত্তিতে হেস্টিংসের আমলে আধুনিক সিভিল সার্ভিসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। এ কাঠামোকেই পরবর্তীতে কর্ণ ওয়ালিস সম্প্রসারিত করে প্রশাসনিক প্রেক্ষাপটে উপস্থিত করেছিলেন। এ সময়ে রাষ্ট্র পরিচালনার সাধারণ শাখার আওতায় যেসব কর্মকান্ড পড়ে বলে ভাবা হতো তা হচ্ছে, রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত ও আইন-শৃংখলা, রক্ষা। ধীরে ধীরে উদীয়মান একটি পুলিসী রাষ্ট্রের জন্য এসব কর্মকান্ড ছিল সার্বিক কর্মকান্ডের একটি প্রাথমিক কাঠামোর মতো। ১৮৫৭ সালের সেপাহী বিদ্রোহের ফল হিসেবে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব বর্তায় খোদ ইংল্যান্ডের রাজতন্ত্রের উপর। ফলে ভারতবর্ষ উপমহাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোর আত্মিক ও কলেবর উভয় দিকের পরিবর্তন ঘটে।

বৃটিশ ভারতে সিভিল সার্ভিসের কর্মকর্তাদের আচার-আচরণে একটা প্রভুত্বমূলক ভাব ছিল। এ দেশীয় প্রশাসক শ্রেণী সাধারণভাবে তাই সরকারী ও ব্যক্তিগত বা পারিবারিক জীবনেও বাহ্যিক আড়ম্বর ও দাপট প্রদর্শনমূলক মনোভাব ব্যক্ত করতে সংকোচ করতেন না। শাসক যন্ত্র ও শ্রেণীর অংশ হিসেবে ইউরোপীয় প্রভুদের মত এ দেশীয় সরকারী কর্মকর্তাগণও তাই কর্তৃত্ব প্রয়াসী হবার প্রবণতা দেখিয়েছেন, যদিও পরাভূত দেশেরই মানুষ ছিলেন। অন্য দিকে ইংরেজ কর্মীদের তুষ্টি সাধনেও তাদের কম ব্যাপৃত থাকতে হত না। দ্বিমুখী ও টানপোড়নে তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছিল। ম্যাকলের কথায় "গায়ের রং ও রক্তে তারা এ দেশীয় কিন্তু মনোভাব, রুচি ও বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে তারা ইংরেজ হয়ে পড়েছিলেন।"

উপমহাদেশে বিভাগোত্তর কালে নতুন সংগঠিত রাষ্ট্রগুলোর সমাজপ্রেক্ষিতে একটি ক্রান্তিলগ্ন উপস্থিত হয়েছিল, যা সরকারী কর্মকর্তাদের ভূমিকার ক্ষেত্রে একটি নতুন দিকের সূচনা কাল। নতুন জাতীয়তাবাদের উদ্ভূত উচ্চাভিলাষে স্বাধীন সরকার তখন পশ্চাৎপদ দেশে দ্রুত আধুনিকীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করলো। এত বিশাল কর্মকান্ড এত দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করতে গেলে রাষ্ট্রের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সনাতনী

দক্ষতা অপরিবর্তিত রেখে করা সম্ভব নয়। তাদের বিশেষ প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। বস্তুত এ থেকেই শুরু হয় সনাতনী মনোভাব জেনারেলিষ্ট সিভিল সাভেন্টের স্থলে 'পেশাদারী' সিভিল সার্ভিস বিকাশের সূচনা। এ সকল আইসিএস এবং পরবর্তীতে দেশবিভাগের পর সিএসপি, ইপিসিএস গঠনের ইতিহাস প্রায় সকলেরই জানা।

বাংলাদেশের বর্তমান প্রশাসনিক ব্যবস্থা

বাংলাদেশে বর্তমান প্রশাসনিক কাঠামোতে সর্বোচ্চ অবস্থানে রয়েছে সচিবালয়। সচিবালয়ে রয়েছে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং এটাই হচ্ছে সরকারের সকল নীতি ও কার্যের উৎসস্থল। মন্ত্রণালয়ের প্রধান হচ্ছেন মন্ত্রী। রুলস অব বিজনেস অনুসারে মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কার্যের ভাগ করা আছে। প্রশাসনিক কাজের জন্য সচিব দায়ী থাকেন। তিনি মন্ত্রণালয়ের প্রধান হিসাব কর্মকর্তা। প্রত্যেক মন্ত্রণালয়ের এক বা একাধিক বিভাগ রয়েছে। বিভাগের দায়িত্বে থাকেন একজন সচিব বা অতিরিক্ত সচিব। মন্ত্রণালয় বা বিভাগের অধীনে রয়েছে উইং, ব্রাঞ্চ এবং সেকশান। উইং এর দায়িত্বে থাকেন একজন যুগ্মসচিব, ব্রাঞ্চের দায়িত্বে থাকেন একজন উপসচিব এবং সেকশানের দায়িত্বে থাকেন সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব।

একটি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ অফিস বা সংযুক্ত বিভাগের মাধ্যমে সরকারের নীতি বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। অধীনস্থ অফিসগুলো সংযুক্ত বিভাগের তত্ত্বাবধানে মাঠ পর্যায়ে কাজ করে থাকে। জনসেবা এবং বিশেষ কোন উন্নয়নমূলক কাজ করার জন্য স্বায়ত্বশাসিত বা আধা স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা রয়েছে। এছাড়া পাবলিক কর্পোরেশনগুলো বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। বর্তমানে যে নতুন রুলস অব বিজনেস কার্যকর হতে যাচ্ছে, তাতে মন্ত্রী তার মন্ত্রণালয়ের অধীন সকল কর্মকর্তার কাজের জন্য জবাবদিহি হবেন।

সরকারের এই দায়িত্ব পরিচালনার জন্য দেশব্যাপী প্রতিযোগিতামুলক পরীক্ষার মাধ্যমে পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক বিভিন্ন ক্যাডারে প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। পরবর্তীতে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ এবং নিজ নিজ একাডেমীতে ক্যাডার ভিত্তিক বিভাগীয় প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

বাংলাদেশের বর্তমান প্রশাসনিক ব্যবস্থার সমস্যাবলী

১। সরকারের কার্য নির্বাহী বিভাগের উপর সংসদ কর্তৃক নিয়ন্ত্রণের একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ গড়ে উঠেনি। যার ফলে পাবলিক সার্ভিসের জবাবদিহি ব্যাহত হচ্ছে।

২। বাংলাদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থা অতিমাত্রায় কেন্দ্রমুখী। কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সর্বোচ্চ পর্যায়ের মতামতের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। উচ্চ পর্যায়ের মতামতই সর্বাধিক গুরুত্ব পায়। এ পদ্ধতি অত্যন্ত জটিল ও প্রলম্বিত। তাছাড়া অধীনস্থ কর্মকর্তার প্রতি উপরস্থ কর্মকর্তার অবিশ্বাস তো রয়েছেই। এর ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে দীর্ঘসূত্রিতার সৃষ্টি হচ্ছে।

৩। বর্তমান আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মকর্তাদের মধ্যে এবং এমনকি সংস্থার মধ্যে পরস্পরের প্রতি একটি অবিশ্বাসবোধ কাজ করছে। এই অবিশ্বাসের

ফলে সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ করতে হচ্ছে। যার ফলে জবাবদিহি গুলিয়ে যাচ্ছে এবং check and balance over lapping হচ্ছে। সর্বোপরি জবাবদিহি ও নিয়ন্ত্রণ উভয়ই বিপর্যস্ত হচ্ছে।

৪। ক্রমবর্ধমান আমলাতন্ত্রকে পরিচালনা করার জন্য অনেক ক্ষেত্রে সরকারকে অপর্যাপ্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের দায়িত্ব দিতে হয়েছে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের লাইন এজেন্সীতে। এর ফলে আন্তঃ মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে যথেষ্ট ব্যাঘাত ঘটছে।

৫। কর্মকর্তা নিয়োগের মানদন্ডে উল্লেখযোগ্য অবনতি হয়েছে। এটি দেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার অবক্ষয়ের ফল। আর একটি জটিলতর দিক হচ্ছে সিভিল সার্ভিসে নিয়োগের ক্ষেত্রে সংরক্ষিত কোটা পদ্ধতি।

৬। পাবলিক সেক্টরে প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে যোগ্য প্রশিক্ষক নেই। তাছাড়া সিভিল কর্মকর্তাদের দেশে প্রশিক্ষণের প্রতি আগ্রহ নেই। এই প্রতিষ্ঠানগুলো যে ধরনের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে তা কর্মক্ষেত্রের কাজের সাথে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত নয়।

৭। প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের ঘন ঘন বদলীর ফলে পাবলিক সেক্টর ব্যবস্থাপনার মান ও দক্ষতা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। মাঝে মাঝে এক বছর বা কম সময়ের মধ্যে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের একাধিক বার বদলী হয়। তিন বছর পর পর বদলীয় যে সাধারণ নিয়ম রয়েছে তা পালন করা হচ্ছে না। ফলে দেখা যায় কোন একজন কর্মকর্তা একটি বিষয়ে পরিপূর্ণ দক্ষতা অর্জন করার পূর্বেই তাকে চলে যেতে হচ্ছে। বিশেষ করে Technical Department গুলোতে এর যথেষ্ট প্রভাব পড়ে।

৮। সিভিল সার্ভিসে মেধার ভিত্তিতে পদোন্নতির বিধান থাকলেও তা যথাযথভাবে পালন করা হচ্ছে না। পদোন্নতির ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠতাই মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। এই ব্যবস্থা কর্মকর্তাদের মোটিভেশন এবং দক্ষতাকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করছে।

১৯৮৯ সালে তৎকালীন সরকার সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিশ্বব্যাংক ও USAID এর সহায়তায় "Public Administration Efficiency Study" নামে একটি সমীক্ষা পরিচালনা করেন। এর রিপোর্ট প্রশাসনের দক্ষতার পথে যে বাধাগুলোর কথা বলা হয়েছে তা হলো ঃ

১। লঘু জবাবদিহি (Diluted accountablility)

২। অতিকেন্দ্রিকতা (Overcentralisation)

৩। জটিল কার্যপদ্ধতি (Complex operating procedures)

৪। দূর্বল সহায়ক পদ্ধতি (Weak support systems)

৫। অপর্যাপ্ত মানব সম্পদ (Inadequate human resources)

প্রশাসনিক দক্ষতার পথে এ বাধাগুলো দূরে করে প্রশাসনকে গতিশীল করার জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশ রাখা যেতে পারে ঃ

সংগঠন ও কাঠামো

১। প্রাথমিকভাবে বাছাই করা মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দফতর, শাখা সেল ও স্বায়ত্ত্বশাসিত সংস্থা নিয়ে পরিকল্পিত সাংগঠনিক সমীক্ষা শুরু করতে হবে। পরবর্তীতে গোটা সরকারের ক্ষেত্রে এটি সম্প্রসারিত হবে। এর ফলে কেন্দ্রীয় সরকার কাঠামো গঠনের সংজ্ঞা পাওয়া যাবে।

২। স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় প্রশাসনকে ক্রমান্বয়ে জোরদার করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে পর্যালোচনা করে যুক্তিসংগতভাবে দায়িত্ব বন্টন পর্যালোচনা ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

৩। কার্যাবলী পরীক্ষার পর এবং নিবিড়, সন্নিবিষ্ট ও সুসংগত করার নীতিমালার ভিত্তিতে সরকার কাঠামো যুক্তিসংগত করতে হবে। সমন্বয় সাধান জোরদার এবং সরকার আয়ত্বে রাখার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সংখ্যা হ্রাসের প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র বিবেচনায় আনতে হবে।

৪। কাজ ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা বরাদ্দ সম্পর্কিত সরকারী আইন ও বিধি বিধান পরিকল্পিতভাবে পর্যালোচনা ও সুষ্ঠুভিত্তিক করতে হবে, যাতে লালফিতার দৌরাত্ম্য ও মাত্রাতিরিক্ত দায়িত্ব বিলোপ করা যায়। এরপর সকল সংশ্লিষ্ট সরকারী ম্যানুয়াল সময়োপযোগী করতে হবে।

৫। সংবিধানের ২২ নম্বর ধারা অনুযায়ী শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথক করা সহ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে।

৬। সংবিধানের ৫৯ ও ৬০ নম্বর ধারা এবং স্থানীয় সরকার পর্যালোচনা কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী স্থানীয় প্রশাসন ও স্থানীয়ভাবে নিয়োজিত অফিসারদেরকে ক্রমান্বয়ে নির্বাচিত স্থানীয় সরকারের নিয়ন্ত্রনাধীনে আনতে হবে।

৭। অডিট পদ্ধতি শক্তিশালী করতে হবে। সেই সাথে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। অডিট ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বাড়াতে হবে।

সিভিল সার্ভিস ব্যবস্থাপনা ঃ

১। কর্মকর্তা নির্বাচন ও পদোন্নতি হবে মেধার ভিত্তিতে। এই মেধা নিরূপণ করতে হবে একটি স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এবং তা সংজ্ঞায়িত হবে এভাবে : (১) নির্বাচনের জন্য প্রদর্শিত যোগ্যতা, বিশেষজ্ঞান ও শিক্ষাগত মান (২) পদোন্নতির জন্য কাজ, পরীক্ষা ও সাফল্যের সঙ্গে বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণ সম্পাদন।

২। পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে শক্তিশালী করতে হবে। এটি করতে হবে সদস্যদের পদমর্যাদা বৃদ্ধি ও চাকরির শর্তাবলী উন্নত করার মাধ্যমে। সচিবালয়, লজিষ্টিক ও টেকনিক্যাল জ্ঞানের মানও উন্নত করা প্রয়োজন। কমিশন যাতে সংবিধানের ১৩৭-১৪১ ধারায় বর্ণিত দায়িত্বসমূহ কার্যকর ও স্বাধীনভাবে সম্পাদন করতে পারে, তা নিশ্চিত করতে হবে।

৩। সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের আওতায় সর্বস্তরের সিভিল সার্ভেন্টদের জন্য পার্সোনেল ম্যানেজমেন্ট নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

৪। সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ার প্রচলিত ধাপগুলো কমাতে হবে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও সংস্থার মধ্যে horizontal communication কে উৎসাহিত করতে হবে।

৫। সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ার যে সভা অনুষ্ঠিত হয় তার কার্যকারিতা বাড়ানোর জন্য এ সভায় অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের পূর্বেই Working Paper তৈরী করা প্রয়োজন, যথাযথ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন এবং সিদ্ধান্তগুলো লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন।

৬। বাস্তবায়নকারী সংস্থার নিকট অধিক ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে Procurement এবং contracting পদ্ধতি সহজতর করতে হবে।

৭। বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরার লক্ষ্যে প্রচলিত আচরণ বিধি সংশোধন করে সেগুলো একটি যথোপযোগী আচরণ বিধিতে সমন্বিত করতে হবে।

৮। ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন ক্যাডারের মধ্যকার পার্থক্য দূর করতে হবে। একই ধরনের ক্যাডারগুলোকে কমসংখ্যক ক্যাডারে একীভূত করে এবং বেতন ব্যবস্থা ও চাকরির শর্তাবলী সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে আন্ত-ক্যাডার পার্থক্য দূর করতে হবে। এর ফলে মেধা ভিত্তিক এবং শীর্ষ পর্যায়ে পদোন্নতির আরো সুযোগ খুলে যাবে।

৯। যুগ্ম-সচিব, অতিরিক্ত সচিব ও সচিব পর্যায়ের অফিসারদের সরাসরি পরিচালনার দায়িত্ব সংস্থাপন মন্ত্রণালয়কে দিতে হবে। অন্য সকল পর্যায়ের অফিসারদের পরিচালনা করবে তাদের নিজ নিজ মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও একাউন্টিং সংস্থাসমূহ।

১০। মন্ত্রণালয়সমূহের বিশেষ ক্যাডারের জন্য পদ সংরক্ষিত রাখার প্রথা বিলোপ করতে হবে এবং সচিবালয়ের পদসমূহের জন্য যোগ্যতা ও প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সকল ক্যাডার থেকে মুক্ত প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করতে হবে।

১১। বর্তমানে ঘন ঘন বদলীর ফলে সরকার পরিচালনায় দক্ষতার ওপর যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্টি করে, তা হ্রাসের লক্ষ্যে একটি উপযুক্ত বদলী নীতি উদ্ভাবনের মাধ্যমে সিভিল সার্ভিসকে পেশাভিত্তিক করে তুলতে হবে।

১২। কর্মকর্তা/কর্মচারী যাতে পদের সংগে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে সেজন্য প্রথম শ্রেণীর অফিসার পদ থেকে শুরু করে সরকারের সকল পদের জন্য পদ-মর্যাদার বিবরণ তৈরী করতে হবে।

১৩। সংবিধানের ৩৩ নম্বর ধারা অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের চাকরিতে নিয়োগ ও চাকরির শর্ত বিধিবদ্ধ করার জন্য যথাযথ সিভিল সার্ভিস আইন ও বিধি প্রণয়ন করতে হবে।

১৪। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপযোগী সিভিল সার্ভিসের কর্মকর্তাদের স্বচ্ছ ও দক্ষ ব্যবস্থাপনার স্বার্থে পদশ্রেণী বিন্যাস এবং গ্রেডের ভিত্তিতে ক্যাডার ও ক্লাসসিষ্টেমের স্থলে পার্সোনেল ম্যানেজমেন্ট সিষ্টেম করতে হবে।

১৫। অফিসের সাজ সরঞ্জাম, ফাইল এবং Paper Work পদ্ধতির আধুনিকীকরণ করতে হবে।

১৬। কম্পিউটার ভিত্তিক Management এবং Information system গড়ে তুলতে হবে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ ঃ

১। জনকেন্দ্রীক উন্নয়ন এবং জনসেবার জন্য নৈতিকতা প্রশিক্ষণ সিডিউলে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

২। কম্পিউটার সজ্জিত করণ, প্রশিক্ষণ সরঞ্জাম এবং অত্যাধুনিক উপকরণ সংগ্রহ ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউটসমূহকে সমৃদ্ধ করতে হবে।

৩। কাজের মূল্যায়ন ও পদোন্নতির সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত পরীক্ষাসমূহ সময়ে সময়ে বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সিভিল সার্ভিসকে পেশাদারমূলক করে তুলতে হবে।

৪। সিভিল সার্ভেন্টদের মধ্যে টেকনিক্যাল ও ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। এ উদ্দেশ্যে নিয়মিত ও পরিকল্পিতভাবে প্রশিক্ষণ চাহিদার মূল্যায়ন করা যেতে পারে।

৫। স্বতন্ত্র অফিসারদের জন্য পেশাগত উন্নতির সুযোগ দিতে হবে। বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন এবং পেশা উন্নয়ন চাহিদার প্রেক্ষিতে এটি স্থির করতে হবে।

৬। সর্বস্তরের সরকারী ইউনিটসমূহে যৌথ টিমের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

৭। স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রণয়ন সম্প্রসারণ ও জোরদার করতে হবে।

৮। সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের চাহিদামাফিক সমস্যার সমাধান ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৯। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতার মানদন্ড কি হবে তা পূর্বে নির্ধারণ করতে হবে এবং মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

নীতি নির্ধারণ ঃ

১। সকল সরকারী তথ্যের জন্য পরিকল্পিত data base গড়ে তুলতে হবে। এক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে নজর দিতে হবে অর্থ, লোক ও কার্য সম্পাদন সম্পর্কিত data এর ওপর।

২। মন্ত্রণালয়সমূহের স্টাফদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং বিশেষজ্ঞ পদ ও ইউনিট সৃষ্টির মাধ্যমে সরকারের নীতি বিশ্লেষণ ক্ষমতা বাড়াতে হবে।

৩। নীতি প্রণয়ন সম্পর্কে পরামর্শদানের জন্য স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গ্রুপ ও বিশেষজ্ঞ গ্রুপের প্রতিনিধিদের উপদেষ্টা পরিষদ ও কমিটি গঠন এবং ব্যবহার করতে হবে।

৪। সিদ্ধান্ত প্রণয়ন সংক্রান্ত বর্তমান আইন ও প্রথা পর্যালোচনা করতে হবে এবং সিদ্ধান্ত প্রণেতা কর্তৃপক্ষ যাতে যথাযথ পর্যায়ে প্রতিনিধিত্ব এবং দায়িত্ব পালন করতে পারে, তা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা উদ্ভাবন করতে হবে।

৫। সংসদ, রাজনৈতিক নির্বাহী ও স্থায়ী নির্বাহীরা যাতে তথ্য পেতে পারেন সে জন্য data base নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে হবে।

৬। মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরে ও অপারেটিং ইউনিটসমূহে যথাযথ পর্যায়ে টিমের দ্বারা যৌথ সিদ্ধান্তগ্রহণ ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।

৭। সরকারী নীতিমালা প্রণয়ন ও উন্নয়নের সহায়ক হিসেবে গবেষণা ও রিপোর্ট প্রণয়নে সক্ষম স্বায়ত্বশাসিত পলিসি 'থিংক ট্যাংক' গড়ে উঠাকে উৎসাহিত করতে হবে।

এ সুপারিশগুলো বাস্তবায়ন করার জন্য জরুরী ভিত্তিতে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে ঃ

১। প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সহযোগিতা প্রয়োজন। এই দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্য হবে একটি গতিশীল প্রশাসন তৈরী করা।

২। এটা বাস্তবায়নের জন্য একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করা প্রয়োজন।

৩। দক্ষতাবৃদ্ধিকরণে বর্তমান সরকারী ব্যবস্থাকে কাজে লাগতে হবে।

৪। বাস্তবায়নকারী সংস্থার নিকট ব্যাপক ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

৫। জবাবদিহি পদ্ধতিকে শক্তিশালী করতে হবে।

অধুনা আমাদের দেশে সকল বিষয়ের জন্য দায়ী করা হয় প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের। কি রাজনীতিবিদ, কি অন্যান্য সরকারী কর্মচারী সবারই যেন এক কথা, সমস্ত অনর্থ, ব্যর্থতা-হতাশা-দারিদ্র-অনুৎপাদনশীলতা-গণতন্ত্রহীনতা সব কিছুর জন্য দায়ী আমলাতন্ত্র এবং প্রশাসন ক্যাডারের কর্তা ব্যক্তিরা। সমস্ত-পাপের বোঝা স্কেপগোটের মত প্রশাসন ক্যাডারের ঘাড়ে চাপিয়ে সবাই যেন নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক, পূত-পবিত্র। বৃটিশ আমলে আমলাতন্ত্র বলতে শুধু-প্রশাসন ক্যাডারকেই বুঝাতো, কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় এ ধারণা পরিবর্তিত হয়েছে। একটি জিনিস মনে রাখতে হবে, সমগ্র প্রশাসন বলতে একটি ক্যাডারকে বুঝালে অত্যন্ত সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ পাবে। Macro দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখতে হবে। প্রশাসন ক্যাডার এবং আমলাতন্ত্র সমার্থবোধক, অন্য কোথাও আমলার অস্তিত্ব নেই; এ ধারণা নিতান্ত অজ্ঞতারই ফলশ্রুতি।

মূলত প্রত্যেক সংগঠনই আমলাভিত্তিক বা আমলাতান্ত্রিক। প্রতিটি সরকারী সংগঠন বা দপ্তরই আমলাতন্ত্রের অংশ; সেটা প্রকৌশলীদের, কৃষিবিদদের, চিকিৎসকদের, পুলিশ বাহিনীর বা তথ্য কর্মকর্তাদের কিংবা যাদেরই হোক না কেন। তাই সার্বিকভাবে সকল পর্যায়ে দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থার কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি) সাভার, ঢাকা পরিচালিত অষ্টাদশ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পাঠক্রমের প্রায়োগিক অংশ হিসেবে "খ" শাখার প্রশিক্ষণার্থী কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারের মূল প্রবন্ধ হিসেবে ডিসেম্বর ২১, ১৯৯৬ তারিখে উপস্থাপিত। (পরিমার্জিত)।

গ্রন্থপঞ্জি

1. *Public Administration Efficiency study report*, Vol-1, Ministry of Establishment, Govt. of the People's Republic of Bangladesh, Dhaka, Nov. 1989.
2. *The Public Administration Sector Study*, Bangladesh, UNDP, 1993.
3. *Asian Studies*, Dept. of Govt. and Politics, Jahangirnagar University, Savar, Dhaka, May, 1985.
4. *Quest for Efficient Administration*, Md. Ali Akbar, Bangladesh Observer, August, 1993.
5. *Prime Minister, Parliament and Administrative* Reforms, M. Anisuzzaman, The Daily Star, July 22, 1996.

স্বাধীনতা ও দেশপ্রেম

এ, এস, এম, আবদুল হালিম

"সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে,
সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালোবেসে।
০ ০ ০ ০
আঁখি মেলে তোমার আলো প্রথম আমার চোখ জুড়ালো,
ঐ আলোতে নয়ন রেখে মুদব নয়ন শেষে।"

মাতৃভূমি মায়ের সমান। মাতৃভূমি তাই সবার প্রিয়। এ দেশে জন্মগ্রহণ করে আমরা আমাদের জীবনকে সার্থক মনে করি। মাতৃভূমির সৌন্দর্য অতুলনীয়। এর দান অপরিসীম। তাই এ দেশের বুকে মৃত্যুবরণ করাও পরম আনন্দ ও সৌভাগ্যের কথা।

আজ আমরা স্বাধীন। স্বাধীনতা দেশের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। যে জাতি পরাধীন সে জাতির কোন গৌরব নেই। স্বাধীনতা একটি জাতিকে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন করে তোলে। তাই জাতির জীবনে স্বাধীনতার সীমাহীন গুরুত্ব রয়েছে। তাই বোধ হয় কবি অনুভব করেছেন–

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায়।"

আমরা কি জানি আসলে স্বাধীনতা কি? আমরা কি স্বাধীনতা বলতে শুধু ব্যক্তি স্বাধীনতার কথা বুঝি? স্বাধীনতা বলতে কি স্বেচ্ছাচারিতা বুঝি? স্বাধীনতা বলতে কি শুধু নিজের সুযোগ-সুবিধা আদায়ের কথা বুঝায়? আসলে কিন্তু তা নয়। স্বাধীনতার অর্থ আরও ব্যাপক। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে "সাধারণভাবে স্বাধীনতা বলতে কোন ব্যক্তির উপর কোন প্রকার নিয়ন্ত্রণ না থাকার অবস্থাকে বুঝায়।" স্বাধীনতার নেতিবাচক ও ইতিবাচক দুটি দিক রয়েছে। নেতিবাচক অর্থে স্বাধীনতা মানুষের পছন্দ ও কার্যকলাপের ক্ষেত্রে বাধা-নিষেধের অনুপস্থিতিকেই বুঝায়। কোন ব্যক্তি কেবল তখনই স্বাধীন হতে পারে যখন সে তার ইচ্ছামত কাজ করতে পারে। অধ্যাপক ঐ. ঊ. ঔ. উমফণ বলেন স্বাধীনতা হলো "Freedom of the

* পরিচালক (বিপনন), বাংলাদেশ জুট মিল্স কর্পোরেশন

individual to express without external hindrances of personality" কিন্তু অপরিসীম স্বাধীনতা আদৌ কোন স্বাধীনতা নয়। স্বাধীনতা কখনো নিয়ম-কানুনের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতিকে বুঝায় না। স্বাধীনতা চূড়ান্ত এমন কিছু নয়, বরং আপেক্ষিক মাত্র। ব্যক্তি যা ইচ্ছা তাই করবে, এরূপ চূড়ান্ত স্বাধীনতা স্বাধীনতা নয়, এর নাম অরাজকতা বা নৈরাজ্য। এটা সত্যিকারের স্বাধীনতার পরিপন্থী। এরূপ অবস্থায় শক্তিশালী ব্যক্তিগণ সমাজের সকল সুবিধা ভোগ করতে পারে। কিন্তু সমাজের দুর্বলতর সদস্যগণের আদৌ কোন স্বাধীনতা থাকে না।

সুতরাং সত্যিকারের স্বাধীনতার অর্থ হল মানুষের আচরণের উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করা। মেকিনি লিখেছেন, "Freedom is not the absence of all restraints but the substitution of rational ones for the irrational." স্বাধীনতার সকল বিধি-নিষেধই স্বাধীনতার পক্ষে প্রতিকূল নাও হতে পারে। আমাদের সামাজিক জীবনযাত্রার স্বার্থে কতগুলো সাধারণ নিয়ম-কানুন ও শৃঙ্খলা পালন করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কোন ব্যক্তিকে যদি ডাকাতির জন্য শাস্তি প্রদান করা হয়, তাহলে মনে করা উচিৎ নয় যে সেই ব্যক্তির স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হয়েছে। সমাজের কল্যাণ ও নিরাপত্তার স্বার্থে যদি কোন বাধা-নিষেধ আরোপ করা হয় তবে তা স্বাধীনতার জন্যই প্রয়োজন। অতএব, সংশ্লিষ্ট জনগণের দ্বারা সমর্থিত বিধি-নিষেধ স্বাধীনতাকে ব্যাহত করে না বরং এর রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে। এটা স্বাধীনতার ইতিবাচক দিক। তবে কেবল অযৌক্তিক বাধা-নিষেধ দূর করা হলেই যে স্বাধীনতা রক্ষিত হবে এমন ভাবার কোন কারণ নেই। যদি মানুষকে তার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়, কেবল তখনই স্বাধীনতা সর্বোত্তমভাবে বিকশিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে। অধ্যাপক লাস্কি বলেন, "By liberty I mean the eager maintenance of that atmosphere in which men have the opportunity to be their best selves. Liberty, therefore, is a product of rights." অতএব মানুষের অধিকারের স্বীকৃতি ও সংরক্ষণের মাধ্যমেই এই পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে।

তাই মানুষের মঙ্গলের জন্য স্বাধীনতা রক্ষার লক্ষ্যে যথাযথ আইন প্রণয়নের প্রয়োজন। প্রয়োজন আইনের শাসন। কারণ আইন স্বাধীনতাকে সযত্নে লালন-পালন করে। কোন আইন অমান্যকারী সন্ত্রাসী বা বিশেষ গোষ্ঠীর চক্রান্তে সাধারণ জনগণের স্বাধীনতা ব্যাহত হতে পারে। এক্ষেত্রে আইন জনগণের অভিভাবক রূপে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে পারে এবং যে কোন চক্রান্ত থেকে জনগণের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে পারে।

আইনের অনুপস্থিতি অথবা আইন অমান্যকারীকে সন্ত্রাসী/নৈরাজ্যবাদী বললে ভুল হবে না। নৈরাজ্যবাদের আভিধানিক অর্থ শাসনবিহীন অবস্থা। নৈরাজ্যবাদ এমন এক মতবাদ যা যে কোন ধরনের সরকারী কর্তৃত্বকেই অপ্রয়োজনীয় বলে গণ্য করে। নৈরাজ্য মতবাদ থেকেই সন্ত্রাসবাদের জন্ম। আমরা আজ সন্ত্রাসের কবলে। সন্ত্রাসী আমাদের চারপাশে, সকল শুভকাজে বাধা হয়ে দাঁড়ায় কতিপয় সন্ত্রাসী। সন্ত্রাস আজ বিদ্যালয়ে, কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, অফিস-আদালতে, ব্যবসা-বাণিজ্যে। শিক্ষাঙ্গনে

সন্ত্রাস তরুণ শিক্ষার্থীর আলোকোজ্জ্বল ভবিষৎকে অন্ধকারের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। শিল্পক্ষেত্রে সন্ত্রাসীর কাল হাত দেশের অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দিচ্ছে। নাগরিক জীবন সন্ত্রাসীদের ভয়ে ভীত, সন্ত্রস্ত। এসব কিছু জাতির জন্য কল্যাণকর নয়। গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টির যে আশা জাতির মনে কাজ করেছিল তা সন্ত্রাসীরা নৈরাজ্যের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

সন্ত্রাসের এ অভিশাপ থেকে রেহাই পেতে হবে। রুখে দাঁড়াতে হবে সন্ত্রাসীদের গতিপথে। ভেঙ্গে দিতে হবে তাদের বিষদাঁত। যে সংগ্রামের মাধ্যমে মানুষ গণতান্ত্রিক মুল্যবোধ লাভের সুযোগ পেয়েছে তা সন্ত্রাসী তৎপরতার জন্য ব্যাহত হতে দেয়া যায় না। আজ মানুষ যদি জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে, তবে জাতির জীবনে অগ্রগতির সম্ভাবনা দূর হয়ে যাবে। সেজন্য গণতন্ত্রের সুষ্ঠু লালনের জন্য এবং গণতন্ত্র থেকে সুফল পাওয়ার মানসে নাগরিক জীবনকে সন্ত্রাসমুক্ত রাখতেই হবে। আসুন সমবেত কণ্ঠে আওয়াজ তুলি সন্ত্রাসবাদ আর নৈরাজ্যবাদ নিপাত যাক।

দেশকে সন্ত্রাসমুক্ত রাখার জন্য সরকার বদ্ধপরিকর। পরিস্থিতির জটিলতা মোকাবিলা করার জন্য সরকার সন্ত্রাস দমন আইন জারী করেছেন। কিন্তু সন্ত্রাস দমন শুধু সরকারের একার দায়িত্ব নয়। এতে প্রত্যেক নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে। গণতন্ত্রকে প্রতিপালন করতে হবে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে। নাগরিকদের ত্যাগের মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। সরকারকে সহযোগিতা করতে হবে। সকলের প্রয়োজন ধৈর্য আর সহনশীলতা। সহনশীল মনোভাব না হলে গণতন্ত্রের বিকাশ ব্যাহত হবে। জাতির বৃহত্তর স্বার্থের কথা বিবেচনা করে দল-মত নির্বিশেষে সন্ত্রাসমুক্ত সমাজের বিধান করতে হবে। সন্ত্রাসের মুল কারণ নিরুপণ করতে হবে এবং তার মুলোৎপাটন করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সন্ত্রাসমুক্ত হলে শিক্ষার পরিবেশ সুন্দর হবে। জাতির মেরুদন্ড সোজা থাকবে। শিল্প কারখানা ব্যবসা-বাণিজ্য সন্ত্রাসমুক্ত হলেই অর্থনীতি চাঙ্গা হবে। তবেই গণতন্ত্র এবং স্বাধীনতা অর্থবহ হবে।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, জনগণ এক সাগর রক্তের বিনিময়ে যেমন স্বাধীনতা অর্জন করেছে, তেমনি অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে এদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে। তারা তাই লব্ধ এই গণতান্ত্রিক অধিকার পেয়ে স্বভাবতই আনন্দিত ও আশান্বিত। আনন্দিত এ কারণে যে স্বৈরশাসনের নিষ্পেষণ থেকে রেহাই পাওয়ার সুযোগ ঘটেছে। আর আশান্বিত এ কারণে যে, জাতির ভবিষ্যৎ অগ্রগতি ও উন্নতির দিকে অগ্রসর হওয়া এখন সম্ভব হবে। নাগরিক জীবনের সর্বাঙ্গীন সুযোগ-সুবিধা বিধানের অনুকূল পরিবেশ এই গণতান্ত্রিক পরিবেশ থেকেই সম্ভব। তাই অনেক প্রত্যাশা নিয়ে জাতি এই গণতান্ত্রিক পদ্ধতির যথাযথ বাস্তবায়নের দিকে তাকিয়ে আছে।

শুধু সন্ত্রাসই নয়,দুর্নীতির বিষবাষ্পে ছেয়ে গেছে জাতি। পৃথিবীর বহু দেশেই দুর্নীতির কম বেশী বিস্তার ঘটেছে। সমাজ জীবনের নানা ক্ষেত্রে: স্কুল-কলেজে দুর্নীতি, প্রশ্নপত্র প্রণয়নে দুর্নীতি, অফিস-আদালতে দুর্নীতি, দুর্নীতি সর্বত্র।

সরকারী আমলা, রাজনৈতিক নেতা-নেত্রী এবং সাধারণ কর্মী অনেকেই এ ব্যাধিতে আক্রান্ত। প্রতিবেশী ভারতে সি, বি, আই নামক তদন্তকারী সংস্থা সম্প্রতি সে দেশের প্রভাবশালী নানা দলের বহু খ্যাতনামা নেতার নানা দুর্নীতির সন্ধান পাচ্ছে তাদের পরিচালিত তদন্তে। জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, ফিলিপাইনস, এমনকি যুক্তরাষ্ট্রও এর কোন ব্যতিক্রম নয়। তবে এ সকল দেশে আইন সবার জন্য সমান। সেখানে ক্ষমতাসীন দলের নেতারাও ঐ তদন্ত ও বিচার থেকে রেহাই পাচ্ছেন না।

আমাদের দেশ, জাতি ও সমাজকে দুর্নীতি যেন গ্রাস করে ফেলেছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনকে দুর্নীতি কুঁরে কুঁরে খাচ্ছে। এতে অবশ্য বিক্ষুব্ধ হচ্ছে সকল স্তরের মানুষ। দুর্নীতির মুলোৎপাটন করাই হবে সরকারের সুদৃঢ় নীতি। আর কোন দুর্নীতিবাজকেই বিচারের হাত থেকে রেহাই দেয়া যাবে না।

পৃথিবী আজ সভ্যতার চরম শিখরে পৌঁচেছে। নারী আর পুরুষ সমান মর্যাদায় সমাসীন। বাংলাদেশ স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী পালন করেছে। অথচ এ পর্যায়ে এসেও আমরা নারীর মর্যাদা দিতে ব্যর্থ হয়েছি। নির্যাতিতা হচ্ছে নারী সমাজ, নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে ছাত্রীগণ। বাংলাদেশের মহিলাগণ নানাভাবে চরম নির্যাতনের শিকার। নারী নির্যাতনের অন্যতম শিকার হচ্ছে ছাত্রীরা। পত্রিকা খুললেই দেখা যায় তারা নিরাপত্তাহীনতায় জর্জরিত। গা শিউরে ওঠে লোমহর্ষক ধর্ষণের খবর পেয়ে। প্রতিনিয়ত খবর আসছে বিয়েতে রাজী না হওয়ায় ছাত্রী অপহরণ বা এসিড নিক্ষেপের। কন্যাকে বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে অভিভাবকের উদ্বেগের সীমা নেই। সবাই আতংকিত, কখন না জানি কোন দুঃসংবাদ আসে তার প্রাণ প্রিয় সন্তানের জন্য।

নারী নির্যাতন করে, ছাত্রীদের নিরাপত্তাহীনা রেখে, পদে পদে তাদের লাঞ্ছিত করে সভ্য সমাজ আশা করা যায় না। মানব সম্পদের বিকাশ কামনা করা যায় না। একদিকে নারী শিক্ষা, নারী সমানাধিকার কথা বলা, অন্যদিকে তাদের নিরাপত্তাহীনতায় রাখা কোন দায়িত্বশীলতার কাজ নয়। যে সব নারী শত বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে, শত সামাজিক বাধা পেরিয়ে লেখাপড়া শিখ্‌তে আসছে, তাদের নির্যাতন করা ঘৃণ্য অপরাধ। এর শাস্তি হওয়া উচিৎ আরও কঠোর। কারণ এ অপরাধে শুধু নারীই নির্যাতিতা হচ্ছে না-সমাজ প্রগতি ও বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে। তাই সমাজ প্রগতি, নারী শিক্ষা ও মানব সম্পদের উন্নয়নের প্রয়োজনে আইনগত প্রশাসনিক-সামাজিক শক্তিতে ছাত্রীদের তথা সমগ্র নারী সমাজকে রাখতে হবে নিরাপদ ও ভীতিমুক্ত।

স্বাধীনতাকে অর্থবহ করা, গণতন্ত্রকে সবল করা আর সন্ত্রাসকে নির্মূল করা, সর্বক্ষেত্রে প্রয়োজন নাগরিকের কর্তব্যবোধ, সচেতনতাবোধ এবং তাদের দেশপ্রেম। দেশপ্রেম মানব জীবনের একটি শ্রেষ্ঠ গুণ ও সম্পদ। দেশপ্রেমের মূলেই আছে মানুষকে ভালবাসা। কবির ভাষায়-

"মিছা মনি মুক্ত হেম, স্বদেশের প্রিয় প্রেম

তার চেয়ে রত্ন আর নাই।"

যিনি কেবল নিজের দেশকে ভালবাসেন তিনি দেশপ্রেমিক। আর যিনি সমগ্র পৃথিবীকে এবং মানুষকে ভালোবাসেন তিনি আরও মহৎ। আমরা বাঙালী-বাংলাদেশী। প্রায় দু শ' বছর ইংরেজকর্তৃক শাসিত ও শোষিত, পঁচিশ বছর বর্বর পাকিস্তানীদের দ্বারা নির্যাতিত। তিরিশ লক্ষ বাঙালী তাঁদের বুকের রক্তের আখরে আমাদের স্বাধীনতার দীপ্তশিখা জ্বালিয়ে গেছেন। দেশপ্রেমিক বাঙালী, কিশোর-কিশোরী, ছাত্র-ছাত্রী, যুবক-যুবতী, শ্রমিক-মজুর নির্বিশেষে আপামর জনসাধারণ দীর্ঘ নয় মাস চরম ত্যাগ স্বীকার করেছেন, প্রাণ দিয়েছেন। এঁদের দেশপ্রেম তুলনাহীন। এঁদের দেশপ্রেমের কথা স্মরণ করলে শ্রদ্ধায় মস্তক নত হয়ে আসে। দেশ প্রেম আমাদের জীবন, আমাদের মরণ।

এখন সময় এসেছে দেশ গড়ার। দেশকে গঠনমুলক পরিকল্পনা দিতে হবে এবং তা বাস্তবায়নে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতে হবে। দেশের উন্নতির জন্য শান্তি-শৃঙ্খলার প্রয়োজন। নাগরিকদের তাদের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। আইনের প্রতি আনুগত্য দেখানো, সরকারি আদেশ-নিষেধ পালন করা সকল নাগরিকের কর্তব্য মনে করতে হবে। অনেক স্বার্থপর লোক স্বীয় স্বার্থ হাসিলের জন্য অনাচারের আশ্রয় নিচ্ছে। নাগরিকগণ তা রোধ করবে। চোরাচালান, কালোবাজারী, দুর্নীতিপরায়নতা রোধ করার দায়িত্বও নাগরিকদের। শিক্ষা বিস্তারের জন্য যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। স্বাস্থ্য রক্ষায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। মনে রাখা দরকার দেশ শুধু সরকারের নয়, দেশ জনগণের। দেশের কল্যাণের কথা নাগরিককেই ভাবতে হবে, সরকারের একার পক্ষে যা কখনই সম্ভব নয়।

মনে রাখতে হবে দেশের আপামর জনসাধারণের কাছে স্বাধীনতা যদি অর্থবহ করে তোলা যায়, যদি সকলের কাছে স্বাধীনতার স্বাদ পৌছে দেয়া যায়, তবেই স্বাধীনতা অর্জনের ত্যাগ এবং তিতীক্ষা সার্থক হবে। আর এভাবেই জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার সপ্ন সফল হবে। স্বাধীনতা নামক পরশমণির পরশে আমরা খাঁটি মানুষ হব, এর পরশে আমাদের দুঃখ কেটে যাবে। আমরা বলতে পারব-

"স্বাধীনতার পরশমণি সবাই ভালবাসে
সুখের আলো জ্বালায় বুকে-দুঃখের ছায়া নাশে।"

---

* প্রবন্ধটি ১৯৯৭ সালের স্বাধীনতা দিবসে বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় পঠিত (ঈষৎ সংশোধিত)।

সরকারী বাজেট (রাজস্ব ও উন্নয়ন)ঃ প্রস্তুতকরণ, বিশ্লেষণ ও পরিবীক্ষণ

মোঃ হাসিবুর রহমান *

ভূমিকা

বাংলাদেশ সংবিধানের ৮১ অনুচ্ছেদ হতে ৯৩ অনুচ্ছেদ, এই মোট ১৩টি অনুচ্ছেদ বাজেট সম্পর্কিত। অনুচ্ছেদগুলির কোনটিতেই বাজেট শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি। বাজেট শব্দটি এসেছে ফরাসী "Bougete" শব্দ হতে এবং এর অর্থ ব্যাগ বা থলে। ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দ হতে বাজেটের প্রবর্তন হয় সর্বপ্রথম বৃটেনে। বৃটীশ অর্থমন্ত্রী একটি চামড়ার ব্যাগে ভরে রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যায়ের হিসাব পার্লামেন্টে নিয়ে যেতেন। সেটা থেকেই বাজেট শব্দের.উৎপত্তি। আমাদের সংবিধানের ৮৭ (১) অনুচ্ছেদে এই বাজেটকে একটি বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি (Annual Financial Statement) হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। ঐ অনুচ্ছেদ মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারের ঐ আর্থিক বিবৃতি থাকা বাধ্যতামুলক। আমাদের বাজেটে আয়কে প্রাপ্তি হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।

বাজেটের সংজ্ঞা

"বাজেট হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট সময়ের সম্ভাব্য আয় ও ব্যয়ের বিবরণ, যেখানে আর্থ-প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া জড়িত।" এই সংজ্ঞাকে বিশ্লেষণ করলে যে চারটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়, তা হচ্ছে ঃ (১) বাজেট একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, যা আমাদের ক্ষেত্রে ১লা জুলাই থেকে ৩০শে জুন পর্যন্ত। এটা ষান্মাসিক, মাসিক বা দৈনিকও হতে পারে। (২) বাজেটে থাকবে ঐ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্ভাব্য প্রাপ্তির বিবরণ (৩) সম্ভাব্য ব্যয়ের বিবরণ এবং (৪) আর্থ পরিকল্পনা প্রণয়ণ ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া।

বাজেট প্রণয়ন

যারা বাজেটের টাকা খরচ করবে তাদের হাতে সর্ব প্রথম বাজেট প্রণীত হয় অর্থাৎ সরকারের নির্বাহী শাখা বা Agencyর হাতে। তারপর অনুমোদন প্রক্রিয়া হয় সংসদে। অত:পর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া হয় নির্বাহী অফিস বা সংস্থায় এবং সর্বশেষ বাজেটের অডিট ও মূল্যায়ন হয় হিসাব বিভাগের হাতে। হিসাব বিভাগের কার্যক্রম

পরিচালক, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা।

আবার প্রথম ধাপে তার পরবর্তী বছরের বাজেট প্রণয়নে ব্যবহৃত হয়।

বাজেট প্রক্রিয়ার ৪টি ধাপ নিচে দেখানো হলো ঃ

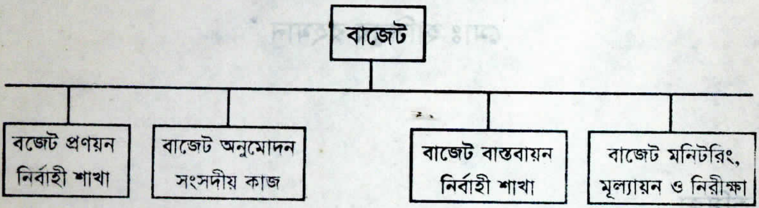

বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী

সংযুক্ত তহবিলের উপর দায়মুক্ত ব্যয় নিম্নরূপ হবে

(ক) রাষ্ট্রপতিকে দেয় পারিশ্রমিক ও তার দপ্তর-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যয়;

* * *

(খ) (অ) স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার,

(আ) সুপ্রীম কোর্টের বিচারকগণ,

(ই) মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক,

(ঈ) নির্বাচন কমিশনারগণ,

(উ) সরকারী কর্ম-কমিশনের সদস্যদিগকে দেয় পারিশ্রমিক;

(গ) সংসদ, সুপ্রীম কোর্ট , মহা নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, নির্বাচন কমিশন এবং সরকারী কর্মকমিশনের কর্মচারীদিগকে দেয় পারিশ্রমিক সহ প্রশাসনিক ব্যয়;

(ঘ) সুদ, পরিশোধ-তহবিলের দায়, মূলধন পরিশোধ বা তার ক্রম-পরিশোধ এবং ঋণসংগ্রহ-ব্যপদেশে ও সংযুক্ত তহবিলের জামানতে গৃহীত ঋণের মোচন- সংক্রান্ত অন্যান্য ব্যয়সহ সরকারের ঋণ সংক্রান্ত সকল দেনার দায়;

(ঙ) কোন আদালত বা ট্রাইবুনাল কর্তৃক প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রদত্ত কোন রায়, ডিক্রি বা রোয়েদাদ কার্যকর করবার জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন পরিমাণ অর্থ; এবং

(চ) এই সংবিধান বা সংসদের আইন দ্বারা অনুরূপ দায়যুক্ত বলে ঘোষিত অন্য যে কোন ব্যয়।

বাজেট ক্যালেন্ডার

ক্রমিক নং	বিবরণ	শেষ তারিখ
১	মন্ত্রণালয় / বিভাগের বাজেট হিসাব সমূহ মুদ্রণ	৩১শে জুলাই
২	বাজেট মুদ্রণ এবং বিতরণ (হিসাব প্রণয়নকারী এবং নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তাদের ফরম সমূহ)	৩১ শে আগষ্ট
৩	বাজেট ফরমের প্রস্তুতি, মুদ্রণ এবং সংশ্লিষ্ট হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার নিকট সরবরাহ	৩০শে সেপ্টেম্বর
৪	হিসাব প্রণয়নকারী কর্মকর্তাবৃন্দ কর্তৃক হিসাব সমূহ পেশ	১০ই অক্টোবর
৫	তিন মাসের প্রকৃত আয়-ব্যয়ের খতিয়ানসহ নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার নিকট হইতে হিসাব রক্ষণ অফিসে এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ে হিসাব প্রাপ্তি	৩১শে অক্টোবর
৬	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার নিকট হইতে তিন মাসের প্রকৃত আয়-ব্যয়ের খতিয়ান সহ একত্রীকৃত হিসাব অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রাপ্তি	২৫শে নভেম্বর
৭	অর্থ মন্ত্রণালয়ে বাজেট হিসাব পরীক্ষার সমাপ্তি	২০শে জানুয়ারী
৮	অর্থ মন্ত্রণালয়ে নতুন ব্যয়ের অনুসূচী প্রাপ্তি	২২শে জানুয়ারী
৯	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার নিকট হইতে ছয় মাসের প্রকৃত আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রাপ্তি	১৫ই ফেব্রুয়ারী
১০	ছয় মাসের প্রকৃত আয়-ব্যয়ের ভিত্তিতে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক হিসাব সমূহের পুনঃপরীক্ষা সমাপ্তি	২৮শে ফেব্রুয়ারী
১১	বাজেটের প্রথম সংস্করণ এবং নতুন ব্যয়ের অনুসূচী প্রস্তুতি এবং মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ	১লা মার্চ
১২	মন্ত্রণালয় হইতে বাজেটের প্রথম সংস্করণ প্রাপ্তি এবং মন্ত্রণালয় /বিভাগ সমূহে প্রেরণ	১০ই মার্চ
১৩	উন্নয়ন কর্মসূচীর জন্য বৈদেশিক সাহায্যের পূর্বাভাস	১৪ই মার্চ
১৪	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাথে হিসাবসমূহ সম্পর্কে আলোচনা সমাপ্তি	২৮শে মার্চ
১৫	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় হইতে চূড়ান্ত উন্নয়ন কর্মসূচী প্রাপ্তি	৮ই মার্চ
১৬	বাজেট দলিলপত্রসমূহের প্রস্তুতি এবং মুদ্রণ	মে

বাজেট প্রস্তুত করণ

১০ই অক্টোবরের মধ্যে এজেন্সি নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার নিকট পাঠালে সেই কর্মকর্তা এজেন্সি প্রতিষ্ঠান বা খরচ করার অফিস কর্তৃক প্রস্তুতকৃত পরবর্তী বছরের বাজেট প্রাক্কলন চলতি অর্থ বছরের ৩ মাসের (জুলাই-সেপ্টেম্বর) প্রকৃত খরচের বিবরণসহ তা অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেন। একটি অনুলিপি নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা সিজিএ অফিসেও পাঠান।অর্থ মন্ত্রণালয় তখন প্রতিটি ব্যয়ের প্রস্তাব প্রচলিত নিয়মে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করেন। এ পর্যন্ত ২০শে জানুয়ারী এসে যায় এবং এর মধ্যে সিজিএ অফিস থেকে ৬ মাসের (জুলাই-ডিসেম্বর) প্রকৃত খরচের একটি সমন্বিত বিবরণী অর্থ মন্ত্রণালয়ে এসে যায়। অর্থ মন্ত্রণালয় এই ৬ মাসের প্রকৃত খরচের ভিত্তিতে বাজেট আলোচনা করে তার কাজ সমাপ্ত করে মন্ত্রী পরিষদ বিভাগের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন গ্রহণ করে এবং পাশ করার জন্য তা সংসদে

পাঠায়। সংসদে প্রথমে অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে প্রশ্নোত্তর পর্ব তারপর সংসদ সদস্যদের মধ্যে দায়যুক্ত ব্যয়ের উপর আলোচনা পর্ব এবং সর্বশেষে অন্যান্য খরচের (সরকারী কর্মচারীদের বেতনাদি ও উন্নয়ন বাজেট)- এর উপর ভোট পর্ব শেষ করে আবার রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের পর বাজেট পাশ হয় ।এই সমস্ত কাজকর্ম ৩০শে জুনের মধ্যে সম্পন্ন হওয়ার কথা।

বাজেট অনুমোদন

যে নির্বাহী অফিস বাজেট খরচ করবে তারা বাজেট ক্যালেন্ডার (পূর্ব পৃষ্ঠায় সংযোজিত ছক) অনুযায়ী বাজেট তৈরী করে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ বা প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় তা ঠিকঠাক করে পাঠায় অর্থবিভাগে এবং অর্থ বিভাগ প্রেরণ করে মন্ত্রী পরিষদ বিভাগে, মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ প্রেরণ করে থাকে রাষ্ট্রপতির নিকট। রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের পর তা সংসদে যায়। সংসদে প্রথম বাজেটের উপর প্রশ্নোত্তর (সংসদ সদস্যদের সঙ্গে অর্থমন্ত্রীর) পর্ব চলে; তারপর চলে সদস্যদের মধ্যে দায়যুক্ত ব্যয়ের উপর আলোচনা পর্ব এবং সর্বশেষ ভোট পর্ব চলে। সংসদে পাশ হবার পর আবার তা যায় রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য। রাষ্ট্রপতি অনুমোদন দিলেই তা এ্যাক্ট রূপে পাশ হয় এবং রাষ্ট্রপতি স্বাক্ষর না দিলেও ৭ (সাত) দিন পরে রাষ্ট্রপতি অনুমোদন দিয়েছেন বলে ধরে নেওয়া হয়; কারণ অর্থ বিলে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন আগে গ্রহণ করেই পরে সংসদে প্রেরণ করা হয়।

বরাদ্দ ও অর্থ ছাড়করণ

বাজেট পাশ হবার পরই অর্থ বিভাগ থেকে বাজেটের বই প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে যায়, প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় এজেন্সি, জেলা অফিস বা নির্বাহী অফিসে বরাদ্দ পাঠালেই বাজেটের টাকা ক্রমান্বয়ে খরচ হয়। উন্নয়ন বাজেটে বরাদ্দের বদলে ফান্ড রিলিজ হয় এবং সেক্ষেত্রে ১ম থেকে ৪র্থ কিস্তিতে বাজেটের টাকা খরচ হয়। তারা রাজস্ব বাজেটের মত প্রতি মাসেই বাংলাদেশ ব্যাংকেও প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার অফিসে যান না। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার অফিস থেকে টাকার চেক তোলে ব্যাংকে জমা রেখে ধীরে ধীরে খরচ করেন। চতুর্থ কিস্তির টাকায় ডি এস এল (ঋণাংশ ও সুদ) পরিশোধিত হয়েছে কি না তা দেখার জন্য অর্থ বিভাগের অনুমোদন লাগে।এক্ষেত্রে পরিকল্পনা কমিশনকেও দেখাতে হয় যে ডি এস এল পরিশোধিত হয়েছে। এ ডি পি বহির্ভূত প্রকল্পে প্রতি কিস্তি রিলিজ এর সময়ই পরিকল্পনা কমিশনে যেতে হয়। এ ডি পি বহির্ভূত প্রকল্প Feasibility Study and ECNEC এর অনুমোদন ছাড়াই এ ডি পি তে গৃহীত হয়ে বাস্তবায়িত হয় এবং পরে এর Feasibility Study and ECNEC এর অনুমোদন হয়। উন্নয়ন বাজেট সম্পর্কে বাংলাদেশ সংবিধানে কিছু লেখা নাই। অনুচ্ছেদ ৮৭ এর (২) এর (ক) ও (খ) এ লিপিবদ্ধ আছে সংযুক্ত তহবিলের দায়যুক্ত ব্যয় (চার্জড) এবং অন্যান্য ব্যয়ের কথা। দায়যুক্ত (চার্জড) ব্যয়ে আছে, যে সমস্ত অফিসে Constitutional Post (যারা Constitution ছাড়া অন্য কারো অধীন নহেন) আছে, সেই সমস্ত অফিসের ব্যয়ের কথা (এটা সংবিধানের ৮৮ অনুচ্ছেদে বিস্তারিত আছে পূর্ববর্তী এক পৃষ্ঠায়)। অন্যান্য ব্যয়ের মধ্যে আছে অন্যান্য সরকারী কর্মচারীদের বেতন ও উন্নয়ন বাজেট। সংসদে দায়যুক্ত ব্যয়ের উপর আলোচন চলে কিন্তু ভোট প্রয়োজন হয় না। কিন্তু অন্যান্য ব্যয়ের উপর ভোট প্রয়োজন হয় এবং তা কমানো যায়, কিন্তু বাড়ানো যায় না। এই সম্পর্কে সংসদে Economy Cut, Policy Cut and Token

Cut Motion চলে থাকে। অন্যান্য ব্যয় Demand for Grants বা মঞ্জুরী দাবী এবং উপযোজন (উন্নয়ন) আকারে পেশ করতে হয়। উন্নয়ন বাজেটে ব্যয়ের খাত আছে কিন্তু আয়ের খাত নাই। পরিকল্পনা কমিশন নির্দিষ্ট সময়ের ভিতর অনুমোদিত এ ডি পি (২০শে মার্চ) অর্থ বিভাগে পাঠায়, অর্থ বিভাগ এ ডি পির প্রকল্প ওয়ারী বরাদ্দগুলোকে বিভিন্ন খাতে-উপখাতে সাজিয়ে একটি উন্নয়ন ব্যয় বিবরণী তৈরী করে থাকে। এটাই এডিবি বা উন্নয়ন বাজেট। উন্নয়ন বাজেটও ভোটেড এক্সপেন্ডিচার। Non Constitutional Posts এর অধীনস্থ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ও উন্নয়ন বাজেটই 'অন্যান্য ব্যয়'। এটা মঞ্জুরী দাবী ও উপযোজন (উন্নয়ন) আকারে সংসদে পেশ করা হয় পাশের নিমিত্তে।

বাজেটের সঙ্গে সম্পর্কিত কতিপয় টেকনিক্যাল বিষয়াদি

(১) Exchequer (২) সংযুক্ত তহবিলের (Consolidated Fund) দায়মুক্ত (Charged) ব্যয় ও অন্যান্য ব্যয় (উপরে আলোচিত হয়েছে) (৩) Appropriation Bill (4) Money Bill, Finance Bill (5) On Account Vote (6) Account Current & CDVAT (7) Major Head, Minor Head (৮) বাজেটে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা (৯) বাজেটে সংসদের ক্ষমতা (১০) অর্থ-বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক ও হিসাব নীরিক্ষা অফিসের সম্পর্ক(১১) বিভিন্ন খাত, উপ-খাত (১২) Suspense Account (১৩) সংশোধিত বাজেট, সম্পূরক বাজেট ও Excess Budget (14) 65-Miscellaneous Head (15) Ways & Means Committee, সংযুক্ত তহবিল ও প্রজাতন্ত্রের National Exchequer। সরকারের সমস্ত প্রাপ্তি বা আয়ই এখানে জমা থাকে। বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারী অফিস নয়; তবে সরকারের সাথে অন্য যে কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা অফিসের মধ্যকার লেনদেনের মধ্যস্থতা এই ব্যাংকই করে থাকে।

নোট ও কারেন্সী

অর্থ বিভাগ যে ১ টাকা বা ২ টাকার নোট ছাপায়, তা কারেন্সী এবং ৫ থেকে ৫০০ টাকার নোট বাংলাদেশ ব্যাংক ছাপিয়ে থাকে। এর জন্য রিজার্ভ প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন নোটে উল্লিখিত টাকায় লেখা থাকে "এর বাহককে চাহিবা মাত্র দিতে বাধ্য থাকিবে" তা ১ টাকা বা ২ টাকার নোট। তার মালিকই সরকার। বাকী নোটের মালিক বাংলাদেশ ব্যাংক। সরকার একান্ত অভাবের সময় বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ধার করতে পারেন Ways & Means Wing এর যুগ্ম সচবিকে বাংলাদেশ ব্যাংকে পাঠিয়ে (বন্ড সহ)। বাংলাদেশ ব্যাংক নির্দিষ্ট পরিমাণ রিজার্ভ (বৈদেশিক মুদ্রায়) রেখে নোট ছাপাতে পারে। বন্যা, খরা প্রভৃতিতে শস্য নষ্ট হলেও বিদেশ থেকে এই রিজার্ভের অর্থ ব্যয় করে তা আমদানী করা যায় বলে মুদ্রাস্ফীতি জনিত কারণে দ্রব্যমূল্য বাড়ে না।

Excess Expenditures

Public Accounts of the Republic এর টাকা মে-জুনে খরচও Excess Expenditures। সরকারের ক্রসড চেক কখনো বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ডিজঅর্নার হয় না। সরকারের অর্থ বিভাগের টাকা বাংলাদেশ ব্যাংকে না থাকলেও বাংলাদেশ ব্যাংক তা দিয়ে দেয়। সরকার বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ধার নিলো এই মর্মে ঐ টাকার অংক ঋণ ও অগ্রিম খাত-৭৮ এ লিপিবদ্ধ থাকবে। প্রয়োজনে সরকার অর্থ বিভাগের Ways & Means Committee এর মাধ্যমে

এর যুগ্ম সচিবকে একটি রিকুইজিশন স্লিপ দিয়ে বন্ড সহ পাঠিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে টাকা ধার করতে পারে। এতে অর্থ মন্ত্রী বা অর্থ সচিবের টেলিফোন লাগে। একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের উপরে গেলে পেনালটি সুদ লাগে। Excess Budget Unexpectd Budget থেকে ভিন্ন এই কারণে যে, এক্সেস বাজেটে সরকারের টাকা থাকে না; বাংলাদেশ ব্যাংক ধার দেয়। কিন্তু Unexpected Budget-এ সরকারের টাকা থাকে এবং তা অর্থ বিভাগের অনুমোদন নিয়ে খরচ করতে হয়।

Supplementary Budget

সংশোধিত বাজেট বা Revised Budget এর টাকা যদি বেঁচে যায় এবং যদি Reappropriation বা পুনঃ উপযোজন না হয়, তখন ঐ টাকা ৩০শে জুনের মধ্যে সরকারের নিকট Surrender করতে হবে। Surrender অথবা Reappropriation Statement অর্থ বিভাগে পাঠাতে হবে। সংশোধিত বাজেটে বর্তমান বছরের বাজেট এষ্টিমেটের চাইতে বেশী টাকা যদি রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে প্রয়োজনে খরচ করা হয়, তখন আলাদা একটি সম্পূরক বাজেট নামের বইতে সংসদ থেকে ঐ খরচের অনুমোদন নিতে হয়; সামনের বছরের বাজেট এষ্টিমেটের সাথে। সম্পূরক বাজেটও অর্থবিল। এতে আগে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন নিয়েই পরে সংসদে উপস্থাপনের কথা। তাই "রাষ্ট্রপতির অনুমোদন নিয়ে" উপরে বলা হলো।

Unexpected খাত

এটা কোন নতুন খরচের বিষয় নয়। যেমন পে-কমিশন এর জন্য কোন একটা পরিমাণে বেতন খাতে বেশী টাকা দেয়া হলো। কিন্তু বাস্তবায়নের সময় দেখা গেলো আরো বেশী টাকা লাগে, তখন এই খাত থেকে টাকা খরচ করতে হয়, অর্থ বিভাগের অনুমোদন নিয়ে। উন্নয়ন বাজেটে Unexpected খাত এর বদলে থাকে আন-এ্যালোকেটেড এ্যামাউন্ট, যখন Project Identify করা হয়নি তখন Un-Allocated Ammount রাখা হয় প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্টের কমিটমেন্ট প্রজেক্ট-এর জন্য, যেগুলো সম্পর্কে আগে চিন্তা ভাবনাই করা হয়নি। এরও Feasibility Study এবং একনেক-অনুমোদন হয়, তবে পরে। এটা ADP বহির্ভূত হলেও পরে ADPএর অন্তর্ভুক্ত করে নিতে হয়। এটা রাজনৈতিকভাবে প্রয়োজনীয় বা Feasible, তাই একে উপেক্ষা করা যায় না।

Money Bill & Finance Bill

অর্থ জড়িত আছে এমন বিল রাষ্ট্রপতির অনুমোদন ব্যতীত সংসদে পাঠানো যাবে না। শুধু অর্থ জড়িত থাকলেই Money Bill হবে না; সংসদের Speaker কে এই মর্মে প্রতিটি বিলেই সার্টিফিকেট দিতে হবে যে তা Money Bill । নতুন কর আরোপ একটা Money Bill, কিন্তু কর কমানো একটা Finance Bill, তাতে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন সংসদে যাওয়ার পূর্বে দরকার নেই। কিন্তু সংসদে পাশ হলেও পরে রাষ্ট্রপতি অনুমোদন না দেওয়া পর্যন্ত কোন টাকাই খরচ করা যাবে না। নির্দিষ্ট সময় পরের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। নির্দিষ্টকরণ আইন সংসদে পাশ না হওয়া পর্যন্তও কোন টাকা খরচ করা যায় না।

Appropriation Bill

৯০(৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্দিষ্টকরণ আইন পাশ না হওয়া পর্যন্ত ব্যতিক্রম ব্যতিত সংযুক্ত তহবিলের কোন অর্থই খরচ করা যাবে না। কৃষি, শিল্প, সচিবালয় ইত্যাদি খাতওয়ারী বাজেট পাশ হতে হয়। কৃষি, শিক্ষা, পুলিশ এর বিভিন্ন খাতে বিভিন্ন অংক বরাদ্দ থাকে। এটাই নির্দিষ্টকরণ আইন। সংসদ নির্দিষ্টকরণ বিল পাশ করেই রাষ্ট্রপতিকে বাজেটের টাকা খরচ করার ক্ষমত দিয়ে থাকে। সমস্ত খরচই রাষ্ট্রপতির নামে হয়।

Reappropriation

ক) যে সমস্ত ক্ষেত্রে পুনঃ উপযোজন করা যাবেনাঃ

(১) বেতন খাত থেকে অন্য আইটেমে এবং অন্য আইটেম থেকে বেতন খাতে (২) পুনঃ উপযোজনকারীর নিয়ন্ত্রণের বাইরের তহবিলের ভিতর পুনঃ উপযোজন করা যাবে না (৩) পরবর্তী বছরেও খরচ করলে চলবে এমন স্থানে ও পুনঃ উপযোজন করা যাবেনা।

খ) কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের অনুমোদন সাপেক্ষে পুনঃ উপযোজন সম্ভব ঃ

(১) বেতন থেকে অন্য আইটেম ও অন্য আইটেম থেকে বেতনে (২) Charged expenditure দিতে হবেই (অন্যান্য বেতন আগে রাজা/রাণীর দয়া ছিল এবং তা কাজের হিসাবে ছিল না)। Charged expenditure হতে অন্যান্য ব্যয় ও অন্যান্য ব্যয় হতে Charged expenditure এ (৩) ডাক, তার ও টেলিফোন, বিদ্যুৎ পানি (ওয়াসা), পৌর কর বা কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে বরাদ্দকৃত তহবিল, যেমন Account Current বা CDVAT এর জন্য (অন্যান্য উদ্দেশ্যমূলক খরচের জন্য বিতর্ক না উঠলেও POL যানবাহন ক্রয় ও মেরামত ইত্যাদির জন্য বিশেষ কারণে বিতর্ক উঠে থাকে) ব্যয় অর্থ বিভাগের অনুমোদন সাপেক্ষে পুনঃউপযোজন করা যায়।

CDVAT & Account Current

CDVAT হচ্ছে Custom duty & আগের Sales Tax। এটা প্রায়ই পরিশোধিত হয়না; তাই বাজেট পাশ করার সময়ই বন্দরের ব্যাংকে ঐ অফিসের নামে একটা হিসাবে টাকা রাখার ব্যবস্থা করা, যাতে বাজেটে বরাদ্দকৃত টাকা সহজেই CDVAT প্রদানে ব্যয়িত হয়। CDVAT থেকে আয়ই এখন মুখ্য আয়। এটা বিভিন্নস্তরে আদায় হয় এবং এই কারণে এর পরিমাণ দিন দিনই বাড়ছে। আগে শুধু সর্বশেষ স্তরে Sales Tax হিসাবে তা আদায় হতো। অর্থনীতির উন্নয়ন হবার জন্যও এর অংক বৃদ্ধি পেয়েছে।

Major Head and Minor Head

অর্থ বিভাগের অনুমোদন ব্যতিত মুখ্য খাতের টাকা অন্য কোন খাতে সরানো যায় না। গৌণ খাতের, উপ খাতের টাকা Head of the Department এক স্থান হতে অন্য উপখাতে ব্যয় করতে পারেন। বাজেট প্রণয়নের সময় পুনঃউপযোজন ক্ষমতা সম্পর্কে সজাগ থাকতে হয়।

বিভিন্ন খাত

(ক) ১-১০০ পর্যন্ত রাজস্ব ও অন্যান্য প্রাপ্তি (খ) ১০১-২০০ পর্যন্ত রাজস্ব ব্যয় (গ) ২০১-৩০০ পর্যন্ত উন্নয়ন বাজেট। মুখ্য খাত প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক, গৌণ খাত ও

উপ-খাত উদ্দেশ্য ভিত্তিক। যেমন-গৌণ ও উপ-খাত বিভাগীয় প্রধান পরিবর্তন করতে পারেন। যেমন ১২৩ এর ১ পুলিশ খাতের পরিচালনা ব্যয়। ৩০০ এর উপরের খাতগুলি Public Accounts of the Republic যেমন G. P. fund এর টাকা।

Demand for Grants

Non constitutional Post এর অফিসের অফিসার ও কর্মচারীদের বেতন ও উন্নয়ন বাজেট অন্যান্য খরচ বা Demand for Grants বা মঞ্জরী দাবী এবং উপযোজন (উন্নয়ন) আকারে সংসদে পেশ করতে হয়। Demand হচ্ছে চাহিদা এবং Grants হচ্ছে মঞ্জুর করার আবেদন।

সংসদে বাজেট অনুমোদনের কতিপয় ব্যতিক্রম এবং Vote on Account

(১) অনুচ্ছেদ ৯২(১) অনুযায়ী ১লা জুলাইর আগে বাজেট নির্ধারিত পদ্ধতিতে পাশ না করা গেলে সংসদ বাজেটের যে কোন অংশ ব্যয় করতে অগ্রিম মঞ্জুরী দিতে পারে। তা সংসদের বিশেষ ক্ষমতা এবং এরই নাম Vote on Account (২) অনুচ্ছেদ ৯২ (৩) (খ) ১লা জুলাইতে বাজেট পাশ নাহলে এবং সংসদও Vote on Accountএ খরচের অনুমোদন না দিলে রাষ্ট্রপতি ৬০দিনের ব্যয় নির্বাহের অনুমোদন দিতে পারেন। সংসদকে সংযুক্ত তহবিলের অর্থ প্রত্যাহারের জন্য অনুরোধ করতে পারেন। (৩) সংসদ ভেঙ্গে গেলে জুন-জুলাইতে রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ৯৩(৩) অনুচ্ছেদ বলে অর্ডিনান্স দিয়ে বাজেট দিতে পারেন। পরবর্তী সংসদ এলে তা উপস্থাপন করতে হয়।

65 Miscellaneous খাত

কোন খাতে টাকা জমা দিতে হবে যখন ঠিক করা হয় না তখন উপরের এই খাতে জমা দিতে হয়। যখন কোন একটি বিষয়ের আয় ও ব্যয় খাত নাই তখনই এরূপ করতে হয়।

Suspense Account

অর্থ বিভাগের বাজেট, প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার অফিস ও বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব যখন সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়না, তখন এই Account এ Book Keeping করতে হয়। এই Account এর টাকার হিসাব যখন মহা-হিসাব রক্ষকের অফিস সময়ের বিবর্তনে মিলাতে পারে তখন আয়ের টাকা ৯৪ নং খাতে এবং ব্যয়ের টাকা ৩১৪ (সুদমুক্ত অগ্রিম) নং খাতে জমা হয়ে যায়। বকেয়া বেতন পরিশোধ করলে এবং গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি, পয়ঃ, পৌরকর, বাড়ীভাড়া, বিভিন্ন কর ঠিকমত আদায় হলেই হিসাব সময়ের বিবর্তনে মিলতে বাধ্য।

Treasury Bill and Inflation Control

সরকার Treasury Bill ছেড়ে অর্থের সংকুলান করতে পারে টাকা না ছাপিয়ে। এভাবেও Inflation নিয়ন্ত্রণ হয়। Bond বিক্রি করেও টাকা সংগ্রহ করা যায়। এভাবে বাজার থেকে টাকা তুলে আনা ও মুদ্রাস্ফীতি কমানো যায় (পে স্কেলের টাকা সঞ্চয় পত্রের মাধ্যমে পরিশোধ ও দাম কমাবার একটা উপায়, এতে সুদ পাওয়া যাবে অনেক।

TOE: (Table of Organizational Equipments)

বাজেটে টাকা থাকলেই তা খরচের অনুমতি দেওয়া যায় না। অন্যান্য প্রশাসনিক দিকও দেখতে হয়। গাড়ী কিনতে হলে তা TOE তে থাকতে হবে। Posts এর অস্তিত্ব আছে কি না, না উঠে গেছে তাও দেখতে হবে। এরূপ অনেক কিছু দেখার আছে। TOE তে না থাকলে ঐ খরচের জন্য অডিট আপত্তি উঠতে পারে। ধীরে ধীরে আপত্তি না মেটালে তা ডিপি হলেই Comptroller & auditor general এর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির নিকট এবং সেখান থেকে সংসদীয় কমিটিতে গেলেই প্রিন্সিপ্যাল এ্যাকাউন্টিং অফিসারকে ঐ কমিটিতে অডিট আপত্তির জন্য জবাবদিহি করতে হবে। এটা খুবই কঠিন কাজ। DP হচ্ছে Draft Para অডিট আপত্তি সংক্রান্ত টেকনিক্যাল টার্ম। অডিট আপত্তি বহুদিন অমীমাংসিত থাকলে সর্বশেষ এটা হয়। দেখতে হয় এটা যেন না হয়। এটা হলেই মন্ত্রণালয়ের সচিবকে (Principal Accounting Officer হিসাবে) সংসদীয় কমিটিতে জবাবদিহি করতে হয় এবং কমিটির সংসদ সদস্যদের (সাংসদের) বিষয়টি পরিস্কারভাবে বুঝাতে হয়। অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হয়।

সংশোধিত বাজেট

গত বছরের বাজেট এষ্টিমেট বিগত তিনমাস ও ৬ মাসের সত্যিকার খরচ দেখে অর্থ বিভাগে বাজেট আলোচনা সভায় রদ বদল করতে হয়, তা সংশোধিত বাজেট বা Revised Budget। গত বছরের বাজেট এষ্টিমেটের চাইতে বেশী টাকা দেওয়া হলেই এতে সংসদের পূর্ব অনুমোদন নেই বলে পরে সম্পূরক বাজেট এর বেশী টাকার জন্য পাশ করানোর দরকার হয়।

সংশোধিত বাজেটে অতি অল্প টাকাই খরচের বাকী থাকে বছর শেষ হওয়ার আগে এবং এটা খুবই অযৌক্তিকভাবে জুন ফাইনালে খরচ করা হয়; এপ্রিল মে মাসের বাজেট আলোচনা সভায় আলোচনা করে নিয়ে। তাই অর্থ বিভাগের আলোচনা সভায় এর যৌক্তিকতা যাচাইয়ের প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী। যেহেতু এই বাড়তি টাকাটা গত বছরের বাজেট এষ্টিমেটের সহিত সংসদে আলোচনায় বা ভোটে আসেনি বলে এর সংসদ অনুমোদন প্রয়োজন হয়। তাই এটা সম্পূরক বাজেট নামে আগামী বছরের বাজেট এষ্টিমেটের সঙ্গে সংসদে পেশ করে ভোটে ও আলোচনায় দিতে হয়। এ যাবৎ অনেক দিন ধরে এই ধরনের সম্পূরক বাজেট আলোচনায় আসেনি। 'টাকাটি আগেই খরচ হয়ে গেছে বিধায়' এই ধরনের শোনা যায়।

আগামী বছরের বাজেট এষ্টিমেটই অর্থ বিভাগের বাজেট আলোচনা সভার মুখ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

উন্নয়ন বাজেটের আয়ের উৎসসমূহ

উন্নয়ন বাজেটের আয়ের উৎস সমূহ হচ্ছে (১) রাজস্ব বাজেটের উদ্বৃত্ত (২) বৈদেশিক ঋণ (৩) বৈদেশিক ঋণের কাউন্টার পার্ট ফান্ড (৪) বাণিজ্যিক ব্যাংকের উদ্বৃত্ত (৫) ইনভেষ্টমেন্ট সিডিউল এর উদ্বৃত্ত (যা প্রাইভেট বিনিয়োগ হতে আসে) (৬) সারচার্জ (৭) এডিপি ঋণ হতে ডিএসএল সংগ্রহ।

বৈদেশিক ঋণঃ

বৈদেশিক ঋণের একাংশ Direct Project Aid এবং অন্য অংশ Reimburseable Project Aid দ্বিতীয়টি আবার দুই ভাগে বিভক্ত GOB অংশ এবং Special Account। GOB অংশ প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার অফিসই বিল পাশ করার মাধ্যমে ছাড় করে থাকে, কিন্তু Special Account এর সঙ্গে প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার অফিসের কোন সম্পর্ক নাই। সম্পর্ক আছে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকের। Special Account আবার ৪ ভাগে বিভক্ত। SAFE.

Impresl Account, CONTASA, DOSA (SAFE=Special Account for foreign exchange) বাংলাদেশ ব্যাংকেই থাকে এর আসল Account এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে অর্থের অবমুক্তি ঘটে। অর্থবিভাগই বলে দেয় কোন অফিসের একাউন্ট নম্বর কত। Imprest Account এ থাকে এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংকের ঋণ (ADB)। এর কার্যক্রম ও SAFE Account এর মতই। CONTASA= Convertable Taka Special Account এ Operate হয় IDA ঋণ এবং DOSA= Dollar special Account এর সঙ্গে Commercial Bank এর কোন সম্পর্ক নাই। বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গেই সমস্ত লেনদেন চলে।

এখানে মজার বিষয় এই যে টাকা না তুলতে পারার জন্য অনেক Aid Utilize হয় না। টাকা তোলাটাও একটা জটিল এবং Technical বিষয়। এক্ষেত্রে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। UNDP ছাড়াও CIDA, SIDA, USAID এর নিকট যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে পারলে TA প্রজেক্ট সহজেই পাওয়া যায়।

DSL

DSL হচ্ছে Debt Servicing Liability এটা ঋণাংশ ও সুদ। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর টাকা (ADP) সুদ ও আসল Ammortization Schedule মোতাবেক শোধ করতে হয়। তাই DSL হচ্ছে ঋণাংশ ও সুদ। অর্থ বিভাগের দায়িত্ব এটা পরিশোধ হচ্ছে কিনা তা দেখার। তাই এ ডি পির চতুর্থ বা শেষ কিস্তির টাকা তুলতে অর্থ বিভাগের অনুমোদন লাগে। জি পি নোট (গভর্ণমেন্ট প্রমিজারী নোট) রিজার্ভ রেখে ঘাট্‌তি বাজেটে সরকারকে জনগণের নিকট থেকে টাকা ধার করতে হয়। ভর্তুকী দিতে হয় কৃষি ও শিল্পে। উৎপাদন না বাড়লেই সরকার কথামত ঋণ শোধ করতে পারে না। যদি কথামত এই টাকা জনগণকে পরিশোধ করা না হয়, তখনই দাম বাড়ে (বন্যা ও খরাজনিত কারণে উৎপাদন আশানুরূপ না হওয়াতে এবং হরতাল, ধর্মঘট, বিদ্যুতের লোডশেডিং এর জন্য শিল্পের উৎপাদন পরিকল্পনামত না হওয়াতে)।

Ammortization Schedule

কত বৎসরে, কত কিস্তিতে ঋণ ও সুদ পরিশোধ করতে হবে তার একটি শর্ত সমন্বিত তালিকাই Ammortization Schedule. ADP ঋণ বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে এই সিডিউল অনুযায়ী পরিশোধ করতে হয়। বাংলাদেশ সরকারের হয়ে অর্থ বিভাগ তা আদায় করে। বিদেশী সংস্থাকে অনেক সময় SLA (Subsidiary loan Agreement) অনুযায়ী ৩% সুদ দিয়ে দেশী বিনিয়োগকারী হতে ১৩% সুদ আদায় করে সরকার সুদের ব্যবসা করে আয় করে থাকে।

Moratorium

এটা পাওনা ঋণ ও সুদের কিস্তি আপাতত স্থগিত রাখার বিষয়। বিশেষ লোকসান ও অর্থাভাবের সময় এটা করতে হয় এবং পরে আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল হলে এই সময়ের সুদের টাকা সহ ঋণাংশ ও সুদ পরিশোধ করতে হয়। বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি বা Exchequer এর টাকা কোথায় কি আছে তার একটা চিত্র এখানে দেওয়া হলো।

বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি
(National Exchequer)

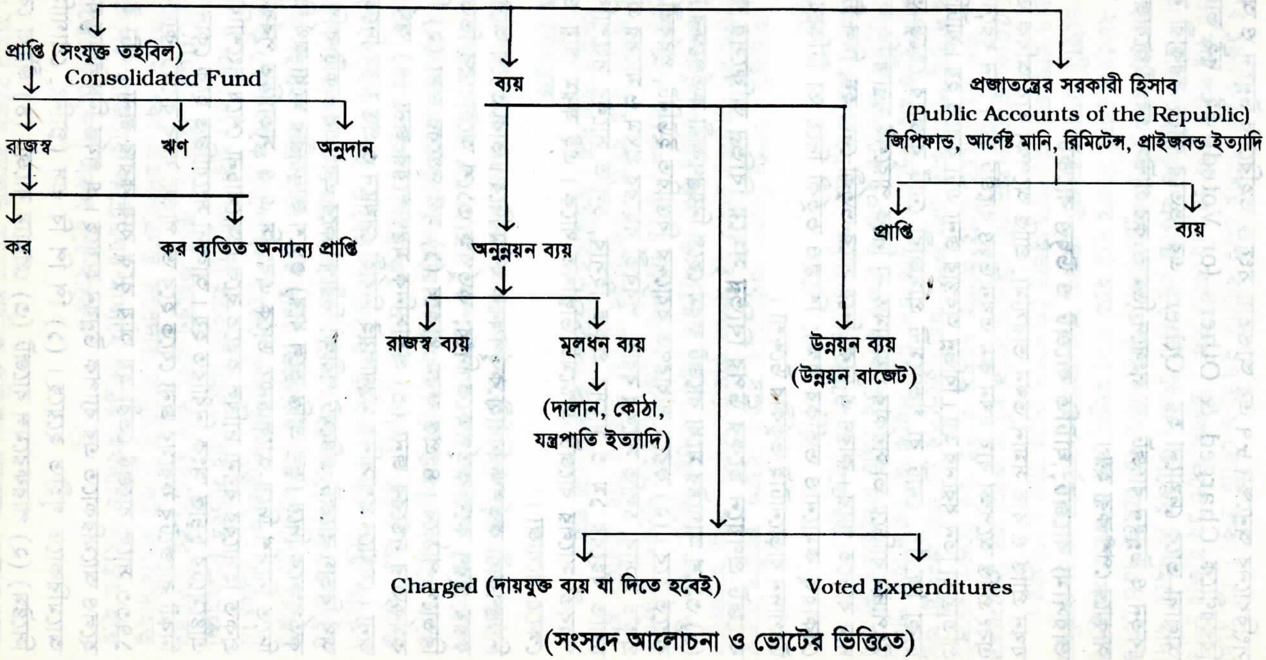

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৮৭ এর আওতায় সংযুক্ত তহবিলের উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন ব্যয় বিবরণীকে Charged & Others (or Voted) এই দুই ভাগে আলাদা আলাদা ভাবে দেখানো হয়। Others এর ভিতরে আছে সরকারী কর্মচারীদের বেতন ও উন্নয়ন বাজেট, যা সংসদে ডিমান্ড কর গ্রান্টস এবং উপযোজন (উন্নয়ন) আকারে পেশ করা হয়।

ভারসাম্য বাজেট, ঘাটতি বাজেট ও উদ্বৃত্ত বাজেট

যখন প্রাপ্তি ও ব্যয় সমান তখন ভারসাম্য, প্রাপ্তি অপেক্ষা ব্যয় অধিক তখন ঘাটতি এবং প্রাপ্তি অপেক্ষা ব্যয় যখন কম তখন উদ্বৃত্ত বাজেট হয়। তিন ধরনের বাজেটের প্রতিক্রিয়া তিন ধরনের হয়। বিভিন্ন অবস্থার জন্য এটা করতে হয়। ঘাটতি বাজেটের টাকা জি, পি, নোট বা গভর্ণমেন্ট প্রমিজারী নোট বাজারে ছেড়ে তুলতে হয়। উৎপাদন বাড়িয়ে তা সরকার ওয়াদামত না দিতে পারলেই মুদ্রাস্ফীতি জনিত কারণে দাম বাড়তে পারে। কারণ এ টাকা দিয়ে সারে ভর্তুকী দেয়া হয়, মিল টিকিয়ে রেখে বেকারত্ব কমানোও ভর্তূকির লক্ষ্য; শিল্পেও ভর্তুকী দিয়ে তা টিকিয়ে রাখা হয়। উৎপাদন বাড়ানোটাই ভর্তুকীর উদ্দেশ্য।

বাজেট প্রণয়নে ছকের উপর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অফিসের কাজ

(১) ৩১শে আগষ্টের মধ্যে বাজেট ফরম ছেপে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করতে হবে। (২) ফরমে সাধারণত বরাদ্দের বিস্তারিত ইউনিট, পূর্ববর্তী দুই বছরের প্রকৃত হিসাব, চলতি সালের বরাদ্দ, পূর্ববর্তী বছরের প্রথম ৬ মাসের প্রকৃত হিসাব, চলতি বছরের ১ম ৩ মাসের প্রকৃত হিসাব, চলতি সালের সংশোধিত বাজেট, পরবর্তী সালের বাজেট এস্টিমেট উল্লিখিত থাকে। এই ফরম আয় ও ব্যয় উভয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ নির্বাহী কর্তৃপক্ষকে ফরম দিবে। তারা ৩১শে অক্টোবরের মধ্যে ফরম পূরণ করে কর্তৃপক্ষকে দিবে; কর্তৃপক্ষ ৩১শে অক্টোবরের ভিতরই তা অর্থ বিভাগে পাঠাবে। ৪ প্রস্ত ফরম থাকবে (১) মূল দপ্তরের জন্য (২) হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার দপ্তরের জন্য (৩) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের জন্য (৪) অর্থ মন্ত্রণালয়ের জন্য। যেখানে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ই নির্বাহী সেখানে ৩ প্রস্ত ফরম দিতে হবে।

অর্থ বিভাগ বাজেট এষ্টিমেট পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এবং এর একটি কপি নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষকে দিয়ে (ভুল ভ্রান্তি তুলে ধরে) ৩১শে জানুয়ারীর মধ্যে অর্থ বিভাগে ফেরৎ দিতে নির্দেশ দিয়ে আলোচনায় ডাকে এবং সি এ ও সত্যায়িত পূর্ববর্তী ৬ মাসের প্রকৃত হিসাবের বর্ণনা দাখিল করতে বলে। আলোচনা শেষে সংশোধিত ও বাজেট এষ্টিমেটের চূড়ান্ত অংক নির্ধারিত হয়। আলাদা সংযোজিত ছকে কোন্ তারিখে কার নিকট বাজেটের ফরমের জন্য যেতে হবে তা পাওয়া যাবে বাজেট ক্যালেন্ডারে।

১৭৩৩ সালে বাজেট তৈরী হয় আয় বুঝে ব্যয় করার জন্য। এটা ইংল্যান্ডে শুরু হলেও আমেরিকাতে এর ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। এ পর্যন্ত নিম্নলিখিত বাজেট পদ্ধতি আমেরিকাতে গৃহীত হয়েছে। (১) পি পি বি এস (প্লানিং, প্রোগামিং বাজেটিং সিষ্টেম) (২) পারফরমেন্স বাজেট (৩) প্রোগ্রাম বাজেট (৪) জীরো বেজড বাজেট (৫) কমপ্রিহেনসীভ বাজেট ইত্যাদি।

বাংলাদেশের ১৯৯৭-৯৮ সালের মোট বাজেট ২৭৭৮৬ কোটি টাকা। এর মধ্যে রাজস্ব খাতের ব্যয় বরাদ্দ হচ্ছে ১৪৫৪৫কোটি টাকা। উন্নয়ন খাতে ১২ হাজার ৮শত কোটি টাকা। এডিপি বহির্ভূত প্রকল্পে ৩৮কোটি টাকা। কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীতে ২শ ৬৫কোটি টাকা, অনুন্নয়ন খাতে মূলধন ব্যয় ধরা হয়েছে ৭৫০ কোটি টাকা। এই ২৮৩৯৮ কোটি টাকার ব্যয় হতে খাদ্য মজুদ, ঋণ ও অগ্রিম সমন্বয়ের পর ২৭৭৮৬কোটি টাকার বাজেট ঘোষণা করা হয়েছে। বর্তমান বছরে প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ৫·৭ ভাগ এবং এডিপিতে অভ্যন্তরীণ সম্পদ থেকে যাবে ৪৭%প্রায়।

শাসনতন্ত্রের ৫৫(৬) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত রুলস অব বিজনেসের সিডিউল-১এ অর্থ মন্ত্রণালয়ের উপর অর্পিত দায়িত্ব বলেই অর্থ বিভাগ বাজেট সম্পর্কে তার দায়িত্ব পালন করে এবং রুলস অব বিজনেসের ১০ ধারা অনুযায়ী অর্থ বিভাগকে জানিয়ে ও এর অনুমোদন নিয়ে অন্য মন্ত্রণালয়কে আর্থিক দায়িত্ব পালন করতে হয়। উন্নয়ন বাজেটের ২০টি ও রাজস্ব বাজেটের ২৯টি বিষয়ে এখনো অর্থ বিভাগকে কনসাল্ট করতে হয় এবং অর্থ বিভাগের অনুমোদন নিতে হয়।

সম্পদ কমিটি

অর্থ বিভাগ, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধিই সম্পদ কমিটির সদস্য। তারা অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সম্পদ বাজেটের জন্য কি পরিমাণ (অর্থ) পাওয়া যেতে পারে, তার একটা এষ্টিমেট দিয়ে থাকেন। তারই ভিত্তিতে বাজেটের মহান উদ্দেশ্য সফলের জন্য বাজেট প্রণীত হয়ে থাকে। প্রজাতন্ত্রের সম্ভাব্য আয় ও ব্যয়, প্রবৃদ্ধির হার, বাজেট হতে অনুমান করা যায়। অর্থনীতির গতিবিধিও বাজেটে বুঝা যায়।

মহা-হিসাব নিয়ন্ত্রক

CGA Office দেখে থাকে GFR, FR, ইত্যাদি অনুসারে বাজেট খরচ হচ্ছে কিনা। Audit এর মাধ্যমে C & Ag office (কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল) বাজেট এর সামগ্রিক হিসাব প্রেসিডেন্টের মাধ্যমে সংসদে উপস্থাপন করে থাকে (অনুচ্ছেদ ১৩২)। মহা-হিসাব নিয়ন্ত্রকের অফিস (CGA) তাকে এই কাজে সহায়তা করে থাকেন। এই ভাবেই বাজেটের উদ্দেশ্য সফল হয়ে থাকে। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় ৩ মাস ও ৬ মাসের প্রকৃত খরচ অর্থ মন্ত্রণালয়ে সরবরাহ করেও বাজেট প্রণয়নে সহায়তা করে থাকে। এই দুটির ভিত্তিতেই অর্থ মন্ত্রণালয়ে বাজেট আলোচনা গুরুত্ব পেয়ে থাকে সংশোধিত বাজেট ও বাজেট প্রাক্কলনে। Rules of Business এর ৪ এর (vi) ধারা অনুযায়ী প্রত্যেক মন্ত্রণালয়ের সচিবই Principal Accounting Officer হিসেবে কাজ করবেন এবং তার মন্ত্রণালয়ের হিসাবের জন্য দায়ী থাকবেন এবং এতদসংক্রান্ত সংসদীয় কমিটির নিকট জবাবদিহিত্ব করবেন। এভাবেই বাজেটারী কন্ট্রোলের মাধ্যমে রাষ্ট্রের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে এবং বাজেটের উদ্দেশ্য সফল হয়ে থাকে।

উপসংহার

অর্থ বিভাগের প্রধান রাজস্ব বাজেট, স্বায়ত্ব শাসিত প্রতিষ্ঠান সমূহের (সম্পন্ন হয়ে যাওয়া প্রকল্পের) রাজস্ব বাজেট এবং উন্নয়ন বাজেট সমন্বয়েই সরকারের পূর্ণাঙ্গ

বাজেট প্রক্রিয়া গঠিত। এই সকল বাজেট প্রস্তুতের মাধ্যমেই সরকার অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায় বিচারের সঙ্গে উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে। বাজেটের আলোচনা পর্বে আসে অর্থ বিভাগ, অনুমোদন প্রক্রিয়ায় আসে মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ, রাষ্ট্রপতি এবং সংসদ এবং বাস্তবায়নে আসে প্রস্তুতকারী নিজেই।

গ্রন্থপঞ্জি

১। Hossain Motahar, *The Syetem of Government Budgeting in Bangladesh* 2nd edition in 1987- হোসেইন পাবলিশার্স, ময়নার টেক, বাড্ডা, ঢাকা-১২

২। *বাংলাদেশ সংবিধান।*

৩। অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, *বাজেট বরাদ্দ (বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি) ১৯৯৭-৯৮।*

৪। হোসেইন জি, *দি বাজেট অব দি পিউপিলস রিপাবলিক অব বাংলাদেশ,* প্রগতি প্রকাশনী, ৩৯ ডিষ্টিলারী রোড, ঢাকা-৪, প্রথম সংস্করণ ১৯৭৮।

৫। Burkhead, *গভর্ণমেন্ট বাজেটিং,* দ্বিতীয় সংস্করণ, মার্চ-১৯৫৯, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে মুদ্রিত, নিউ ইয়র্ক, John Wiley & Sons, Inc-London Chapman & Hall Limited.

৬। *সচিবালয় নির্দেশমালা ১৯৭৬।*

বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের চাহিদা ও কার্যকারিতা বিশ্লেষণ ঃ লোক প্রশাসন প্রসঙ্গ

মোঃ সিরাজুল ইসলাম *

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

লোক-প্রশাসন সাময়িকীর অষ্টম সংখ্যায় (মার্চ, ১৯৯৭) "বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের চাহিদা ও কার্যকারিতা বিশ্লেষণঃ বাংলাদেশ চর্চা প্রসঙ্গ" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত প্রবন্ধে সিভিল সার্ভিস প্রশিক্ষণের ঐতিহাসিক পটভূমি, প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ প্রক্রিয়া, প্রবন্ধের উদ্দেশ্যাবলী, তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতিসহ গবেষণা প্রবন্ধ প্রণয়ন সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাই এ প্রবন্ধে এ সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়নি, শুধু লোক প্রশাসন বিষয়ে সংগৃহীত তথ্য ও উপাত্তসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। লোক প্রশাসন বিষয়ের অধিবেশনসমূহের তালিকা সংযোজনী 'ক' তে সন্নিবিশিত হয়েছে।

৮.১ লোক প্রশাসন

৮.১.১ উপ-অবয়ব ঃ লোক প্রশাসনে নৈতিকতা

প্রশিক্ষণপূর্ব ও প্রশিক্ষণোত্তর উভয় ক্ষেত্রেই উপর্যুক্ত উপ-অবয়বের সকল অধিবেশনসমূহ প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাদের কর্মজীবনের জন্য প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে (সারণী-২০)। গড়ে ৯৫.৯% কর্মকর্তা এর সপক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। প্রশিক্ষণ পূর্বে এ হার ৯৭.৪% এবং প্রশিক্ষণোত্তর পর্বে এ হার ৯৪.৩%। প্রশিক্ষণ পূর্ব ও প্রশিক্ষণোত্তর পর্বে প্রকৃত তারতম্যের হার মাত্র ৩.১%। গড় হারের (৯৫.৯%) চেয়ে এ হার প্রশিক্ষণ পূর্বে-১.৫% বেশী এবং প্রশিক্ষণোত্তর পর্বে ১.৬% কম। উভয়ে ক্ষেত্রেই কর্মজীবনে সংশ্লিষ্ট উপ-অবয়বের গুরুত্ব ৯০% এর বেশী। গড়ে উপ-অবয়বটি ৮৩.৪% ক্ষেত্রে যথেষ্ট ও তার অধিক গুরুত্বপূর্ণ (প্রশিক্ষণ পূর্বে এ হার ৮৫.৪% এবং প্রশিক্ষণোত্তর পর্বে ৮১.৩%) হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

বিশেষায়িত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অনুষদ সদস্য কর্তৃক প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরুপণ ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন সঠিক হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছে। তাই যৌথ বিশেষজ্ঞ মতামত পাঠ্যসূচী প্রণয়নে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

* উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

সারণী-২০ ঃ ''কর্মজীবনে প্রশাসনে নৈতিকতা'' উপ-অবয়বের গুরত্ব/প্রাসঙ্গিকতা

	কর্মজীবনে উপ-অবয়বের গুরুত্ব/প্রাসঙ্গিকতা				মোট
মতামত	মোটেও না	সামান্য	যথেষ্ট	অনেক	
ক) প্রশিক্ষণপূর্ব	১৮ (২.৬)	৮৩ (১২)	২৫০ (৩৬.৪)	৩৩৮ (৪৯)	৬৮৯ (১০০)
খ) প্রশিক্ষণোত্তর	৩৩ (৫.৭)	৭৫ (১৩)	২৯২ (৫০.৫)	১৭৮ (৩০.৮)	৫৭৮ (১০০)
তারতাম্য (হ্রাস/বৃদ্ধি)	১৫ (বৃদ্ধি) (৩.১) (বৃদ্ধি)	৮ (হ্রাস) (১) (বৃদ্ধি)	৪২ (বৃদ্ধি) (১৪.১) (বৃদ্ধি)	১৬০ (হ্রাস) (১৮.২) (হ্রাস)	১১১ (হ্রাস) (০)

প্রশিক্ষণ পূর্ব মতামত অনুযায়ী ৯৭.২% কর্মকর্তা (১৭.৮% সামান্য, ৩৬.৮% যথেষ্ট এবং ৪২.৬% অনেক প্রয়োজনীয়তা) প্রশাসনে নৈতিকতা উপ-অবয়বে প্রশিক্ষণ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন (সারণী-২১)। মাত্র ২.৮% কর্মকর্তা এর বিপক্ষে অভিমত প্রকাশ করেছেন। যাঁরা এর বিপক্ষে মতামত দিয়েছেন তাঁরা হয় সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন অথবা তাঁদের নৈতিকতা বিষয়ে জ্ঞানার্জনে আগ্রহ নেই। দুর্নীতি পরায়ণ সমাজে নৈতিকতা সম্পর্কে এ ধরনের অনীহা স্বাভাবিক বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

প্রশিক্ষণোত্তর পর্বে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। প্রশিক্ষণ পূর্বে ৯৭.২% প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পেয়ে ৬৮.৬%এ দাঁড়িয়েছে। অপর দিকে যথেষ্ট বা তার অধিক প্রয়োজনীয়তা প্রশিক্ষণ পূর্বে ৭৯.৪% থেকে ৩৫.২% এ হ্রাস পেয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রকৃত হ্রাস ৪৪.২%। অর্থাৎ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা লাঘব করা সম্ভব হয়েছে। এ ফলাফল প্রশিক্ষণের ইতিবাচক প্রভাব প্রতীয়মান করে।

সারণী-২১ঃ ''প্রশাসনে নৈতিকতা'' উপ-অবয়বে প্রশিক্ষণের প্রযোজনীয়তা

	প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা				
মতামত	মোটেও না	সামান্য	যথেষ্ট	অনেক	মোট
ক) প্রশিক্ষণপর্ব	২০ (২.৮)	১২৪ (১৭.৮)	২৫৮ (৩৬.৮)	২৯৮ (৪২.৬)	৭০০ (১০০)
খ) প্রশিক্ষণোত্তর	১৭৮ (৩১.৪)	১৮৯ (৩৩.৪)	১৬৫ (২৯০)	৩৫ (৬.২)	৫৬৭ (১০০)
তারতম্য (হ্রাস বৃদ্ধি)	১৫৮ (বৃদ্ধি) (২৮.৬) (বৃদ্ধি)	৬৫ (বৃদ্ধি) (১৫.৬) (বৃদ্ধি)	৯৩ (হ্রাস) (৭.৮) (হ্রাস)	২৬৩ (হ্রাস) (৩৬.৪) (হ্রাস)	১৩৩ (হ্রাস) (০)

সারণী-২২ এ প্রশাসনে নৈতিকতা উপ-অবয়বের অধিবেশন-ভিত্তিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তার তুলনামূলক চিত্র দেখানো হয়েছে। উক্ত সারণী অনুযায়ী লোপ্র-৫ অধিবেশনে সার্বিকভাবে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক হ্রাস পেয়েছে (৫৩%)। এ হ্রাস লোপ্র-৬ এর ক্ষেত্রে ৪৯.৪% (দ্বিতীয় সর্বাধিক) এবং লোপ্র-৪ এর ক্ষেত্রে ৩৫.২% (সর্বনিম্ন)। গড়ে ৪৪.২% প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পেয়েছে। এ হ্রাস প্রশিক্ষণের উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক ফলাফল প্রতীয়মান করে। প্রশিক্ষণের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা হ্রাসেও লোপ্র-৫ সর্বাধিক (১৪.২%), লোপ্র-৯ দ্বিতীয় সর্বাধিক (১২.৪%) এবং লোপ্র-১ সর্বনিম্ন (০.৪%)। যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা হ্রাসে লোপ্র-১ সর্বনিম্ন হলেও

সার্বিকভাবে সর্বনিম্ন নয়। প্রশিক্ষণের অনেক প্রয়োজনীয়তা ৩৪.৯% হ্রাস পাওয়ায় এক্ষেত্রে প্রকৃতহ্রাসের পরিমাণ ৩৫.৩%। প্রশিক্ষণের অনেক প্রয়োজনীয়তা হ্রাসে লোপ্র-১১ সর্বাধিক (৪৫.%), লোপ্র-৮ দ্বিতীয় সর্বাধিক (৪৩.২%) এবং লোপ্র-৪ সর্বনিম্ন (২৫.৭%)। সার্বিকভাবে লোপ্র-৪ সর্বনিম্ন (৩৫.২%) এবং লোপ্র-১ দ্বিতীয় সর্বনিম্ন (৩৫.৩%)।

সারণী-২২ ঃ ''প্রশাসনে নৈতিকতা'' উপ-অবয়বের অধিবেশন ভিত্তিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা	অধিবেশনভিত্তিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা / অধিবেশন কোড / লোপ্র											
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
ক) যথেষ্ট প্রয়োজন প্রশিক্ষণপূর্ব	১৫ (৩০.৯)	২১ (৩৮)	২২ (৩৬.৬)	২১ (৩৫)	২৩ (৩৯.৭)	২১ (৩৬.২)	২৩ (৩৯)	২১ (৩৫.৬)	২৪ (৪০.৭)	২২ (৩৭.৯)	১৯ (৩২.৮)	২৩ (৩৯.৭)
প্রশিক্ষণোত্তর	১৭ (৩১.৩)	১৫ (৩০)	১৩ (২৭.৭)	১২ (২৫.৫)	১২ (২৫.৫)	১৪ (২৯.৮)	১৪ (২৯.৮)	১৪ (২৯.৮)	১৩ (২৮.৩)	১৩ (২৭.৭)	১৫ (৩১.৯)	১৫ (৩২.৬)
তারতম্য (হ্রাস)	২ (০.৪)	৬ (৮)	১৮ (৮.৯)	৯ (৯.৫)	১১ (১৪.২)	৭ (৭)	৯ (৯.২)	৭ (৫.৮)	১১ (১২.৪)	৯ (১০.২)	৪ (০.৯)	৮ (৭.১)
খ) অনেক প্রয়োজন প্রশিক্ষণ পূর্ব	২৬ (৪৭.৩)	২৩ (৩৯.৬)	২২ (৩৬.৭)	১৮ (৩০)	২৫ (৪৩.১)	২৭ (৪৬.৬)	২৬ (৪৪.১)	২৮ (৪৭.৭)	২৪ (৪০.৭)	২৩ (৩৯.৭)	৩১ (৫৩.৫)	২৫ (৪৩.১)
প্রশিক্ষণোত্তর	৬ (১২.৪)	৫ (১০)	২ (৪.২)	২ (৪.৩)	২ (৪.৩)	২ (৪.২)	২ (৪.২)	২ (৪.২)	২ (৪.২)	৪ (৮.৪)	৪ (৮.৫)	২ (৪.৪)
তারতম্য (হ্রাস/বৃদ্ধি)	২০ (৩৪.৯)	১৮ (২৯.৬)	২০ (৩২.৫)	১৬ (২৫.৭)	২৩ (৩৮.৮)	২৫ (৪২.৪)	২৪ (৩৯.৯)	২৬ (৪৩.২)	২২ (৩৬.৪)	১৯ (৩১.৩)	২৭ (৪৫)	২৩ (৩৮.৭)
প্রকৃত (Net) তারতম্য (হ্রাস)	২২ (৩৫.৩)	২৪ (৩৭.৬)	৩৮ (৪১.৪)	২৫ (৩৫.২)	৩৪ (৫৩)	৩২ (৪৯.৪)	৩৩ (৪৯.১)	৩৩ (৪৯)	৩৩ (৪৮.৮)	২৮ (৪১.৫)	৩১ (৪৫.৯)	৩১ (৪৫.৮)

সারণী-২৩ এ প্রশিক্ষণপূর্ব ও প্রশিক্ষণোত্তর পর্বে প্রশিক্ষণের চাহিদার পরিবর্তন দেখানো হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সারণী অনুযায়ী প্রশিক্ষণ পূর্বে মোট প্রশিক্ষণ চাহিদা ৯৭.৩% থেকে হ্রাস পেয়ে প্রশিক্ষণোত্তর পর্বে ৮১.৫% এ দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ চাহিদা সার্বিকভাবে ১৫.৮% হ্রাস পেয়েছে। তবে যথেষ্ট ও অনেক প্রশিক্ষণ চাহিদা ২৩.৮% হ্রাস পেয়েছে। প্রশিক্ষণ পূর্ব ও প্রশিক্ষণোত্তর পর্বে প্রশিক্ষণ চাহিদার এ পরিবর্তন নিঃসন্দেহে প্রশিক্ষণের ইতিবাচক ফলাফল প্রমাণ করে।

সারণী-২৩ ঃ "প্রশাসনে নৈতিকতা" উপ-অবয়বে প্রশিক্ষণ চাহিদার পরিবর্তন

	প্রশিক্ষণ চাহিদার পরিবর্তন				মোট
মতামত	মোটেও না	সামান্য	যথেষ্ট	অনেক	
ক) প্রশিক্ষণপূর্ব	৩৮ (২.৭)*	২০৭ (১৫)	৫০৮ (৩৬.৫)	৬৩৬ (৪৫.৮)	১৩৮৯ (১০০)
খ) প্রশিক্ষণোত্তর	২১১ (১৮.৫)	২৬৪ (২৩)	৪৫৭ (৪০)	২১৩ (১৮.৫)	১১৪৫ (১০০)
তারতম্য (হ্রাস/বৃদ্ধি)	১৭৩ (বৃদ্ধি) (১৫.৮) (বৃদ্ধি)	৫৭ (বৃদ্ধি) (৮) (বৃদ্ধি)	৫১ (হ্রাস) (৩.৫) (বৃদ্ধি)	৪২৩ (হ্রাস) (২৭.৩) (হ্রাস)	২৪৪ (হ্রাস) (০)

সারণী-২৪ এ অধিবেশন ভিত্তিক প্রশিক্ষণ পূর্ব ও প্রশিক্ষণোত্তর প্রশিক্ষণ চাহিদার পরিবর্তন উপস্থাপিত হয়েছে। উক্ত সারণী অনুযায়ী সার্বিকভাবে লোপ্র-৯ অধিবেশনে সর্বাধিক (২৮.৬%) লোপ্র-৫ ও লোপ্র-৭ অধিবেশনে দু'টি দ্বিতীয় সর্বাধিক (২৮.১%) এবং লোপ্র-৪ অধিবেশন সর্বনিম্ন (১৫.৯%) চাহিদার পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছে।

প্রশিক্ষণোত্তর পর্বে যথেষ্ট প্রশিক্ষণ চাহিদা গড়ে ৩.৫% বৃদ্ধি পেলেও অনেক প্রশিক্ষণ চাহিদা ২৭.৩% হ্রাস পেয়েছে। ফলে সার্বিকভাবে গড়ে প্রকৃত চাহিদার হ্রাস ২৩.৮%। অর্থাৎ অনেক প্রশিক্ষণ চাহিদা, যথেষ্ট প্রশিক্ষণ চাহিদার চেয়ে অধিকতর হ্রাস পেয়েছে। এ ফলাফলও প্রশিক্ষণের ইতিবাচক ভূমিকা প্রমাণ করে।

সারণী-২৪ ঃ ''প্রশাসনে নৈতিকতা'' উপ-অবয়বের অধিবেশন ভিত্তিক প্রশিক্ষণ চাহিদার পরিবর্তন

প্রশিক্ষণ চাহিদা	অধিবেশনভিত্তিক প্রশিক্ষণ চাহিদা অধিবেশন কোড (লোপ্র)											
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
ক) যথেষ্ট চাহিদা প্রশিক্ষণপূর্ব	৩১ (২৭,৯)	৩৯ (৩৪,৫)	৪৩ (৩৭)	৩৮ (৩২)	৪৪ (৩৭.৯)	৪২ (৩৬.২)	৪৫ (৩৮.৫)	৪৩ (৩৬.৭)	৫১ (৪২.৯)	৪৬ (৩৯.৩)	৪০ (৩৫)	৪৬ (৪০.৪)
প্রশিক্ষণোত্তর	৩৭ (৩৮.৫)	৩৭ (৩৭.৪)	৩৯ (৪১)	৩৯ (৪০.৬)	৩৯ (৪০.২)	৪০ (৪১.৭)	৩৭ (৩৯.৪)	৩৭ (৩৯.৪)	৩৭ (৩৯.৮)	৩৭ (৩৮.৯)	৪০ (৪১.৭)	৩৮ (৪০.৫)
তারতম্য (হ্রাস) (বৃদ্ধি)	৬(বৃদ্ধি) (১০.৬) বৃদ্ধি	২হ্রাস (২.৯) বৃদ্ধি	৪ (হ্রাস) (৪) বৃদ্ধি	১ (বৃদ্ধি) (৮.৬) বৃদ্ধি	৫ (হ্রাস) (২.৩) বৃদ্ধি	২ (হ্রাস) (৫.৫) বৃদ্ধি	৮ (হ্রাস) (০.৯) বৃদ্ধি	৬ (হ্রাস) (২.৭) বৃদ্ধি	১৪ (হ্রাস) (৩.১) হ্রাস	৯ (হ্রাস) (০.৪) হ্রাস)	০ (৬.৭) বৃদ্ধি	৮ (হ্রাস) (০.১) বৃদ্ধি
খ) অনেক চাহিদা প্রশিক্ষণ পূর্ব	৬২ (৫৫.৯)	৫৫ (৪৮)	৫০ (৪৩.১)	৪৪ (৩৭)	৫২ (৪৪.৯)	৫৫ (৪৭.৪)	৫৫ (৪৭)	৫৭ (৪৮.৭)	৫২ (৪৩.৭)	৪৯ (৪১.৯)	৬০ (৫২.৭)	৪৫ (৩৯.৪)
প্রশিক্ষণোত্তর	২৭ (২৮.২)	২৫ (২৫.৩)	১৫ (১৫.৮)	১২ (১২.৫)	১৪ (১৪.৫)	১৫ (১৫.৬)	১৭ (১৮)	১৭ (১৮)	১৭ (১৮.২)	১৭ (১৭.৯)	২০ (২০.৮)	১৭ (১৮.১)
তারতম্য (হ্রাস/বৃদ্ধি)	৩৫ (হ্রাস) (২৭.২) হ্রাস	৩০ (২২.৭)	৩৫ (২৭.৩)	৩২ (২৪.৩)	৩৮ ৩৮.৪	৪০ (৩১.৮)	৩৮ (২৯)	৪০ (৩০.৭)	৩৫ (২৫.৫)	৩২ (২৪)	৪০ (৩১.৯)	২৮ (২১.৬)
প্রকৃত (Net) তারতম্য (হ্রাস)	২৯ (হ্রাস) (১৬.৬) হ্রাস	৩২ (১৯.৮)	৩৯ (২৩.৩)	৩১ (১৫.৯)	৪৩ (২৮.১)	৪২ (২৬.৩)	৪৬ (২৮.১)	৪৬ (২৮)	৪৯ (২৮.৬)	৪১ (২৪.৪)	৪০ (২৫.২)	৩৬ (২১.২)

৯৫.৪% প্রশিক্ষণোত্তর পর্বে। প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর উপ-অবয়বটির গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। যথেষ্ট ও অনেক গুরুত্বও প্রশিক্ষণোত্তর পর্বে ৭৮.৪% থেকে ৮৪.৪% এ বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা লাভের ফলে প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ উপ-অবয়বটির গুরুত্ব অধিকতর উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন।

সারণী-২৫ঃ কর্মজীবনে ''সরকারী পদ্ধতি'' উপ-অবয়বের গুরুত্ব/প্রাসঙ্গিকতা

	কর্মজীবনে উপ-অবয়বের গুরুত্ব/প্রাসঙ্গিকতা				মোট
মতামত	মোটেও না	সামান্য	যথেষ্ট	অনেক	
ক) প্রশিক্ষণ পূর্ব	২৮ (৫.৩)	৮৫ (১৬.৩)	২২৮ (৪৩.৯)	১৭৯ (৩৪.৫)	৫২০ (১০০)
খ) প্রশিক্ষণোত্তর	২০ (৪.৬)	৪৮ (১১)	(২০৯) (৪৭.৮)	১৬০ (৩৬.৬)	৪৩৭ (১০০)
তারতম্য (হ্রাস/বৃদ্ধি)	৮ (হ্রাস) (০.৭) (হ্রাস)	৩৭ (হ্রাস) (৫.৩) (হ্রাস)	১৯ (হ্রাস) (৩.৯) (বৃদ্ধি)	১৯ (হ্রাস) (২.১) (বৃদ্ধি)	৮৩ (হ্রাস) (০)

সারণী-২৬এ প্রদর্শিত পরিসংখ্যান (প্রশিক্ষণ পূর্ব মতামত) অনুযায়ী ৯৭.% প্রশিক্ষণার্থী সরকারী পদ্ধতি উপ-অবয়বে প্রশিক্ষণ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। শতকরা ৮০.৯% ভাগ ক্ষেত্রে এ প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট ও তার অধিক। প্রশিক্ষণোত্তর পর্বে এ হার ৮০.৯% থেকে ৩৬.৪% এ হ্রাস পেয়েছে (প্রকৃত হ্রাস ৪৪.৫%)। নিঃসন্দেহে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তার এ হ্রাস প্রশিক্ষণের ইতিবাচক প্রভাব প্রমাণ করে।

প্রশাসনে নৈতিকতা উপ-অবয়বে যথেষ্ট ও তার অধিক প্রশিক্ষণ প্রয়োজনীয়তা ৪৪.২% (সারণী-২১) হ্রাস পেয়েছে। এ উপ-অবয়বের কৃতকার্যতাও উক্ত উপ-অবয়বের অনুরূপ (৪৪.৫%)। উভয় উপ-অবয়বের ফলাফল অত্যন্ত ঘনিষ্টভাবে সম্পৃক্ত ও সঙ্গতিপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হয়। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সম্পূর্ণভাবে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণভাবে লাঘব করা সম্ভব নয়। তাই প্রশিক্ষণকে একটি অব্যাহত প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করা বাঞ্ছনীয় এবং এ জন্যে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে মাঝে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা সমীচীন হবে।

সারণী-২৬ ''সরকারী পদ্ধতি'' উপ-অবয়বে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

	কর্মজীবনে উপ-অবয়বের প্রয়োজনীয়তা				মোট
মতামত	মোটেও না	সামান্য	যথেষ্ট	অনেক	
ক) প্রশিক্ষণ পর্ব	১২ (২.৩)	৮৮ (১৬.৮)	২৩৫ (৪৪.৯)	১৮৮ (৩৬)	৫২৩ (১০০)
খ) প্রশিক্ষণোত্তর	১০৭ (২৩.৮)	১৭৮ (৩৯.৮)	১৩৫ (৩০.১)	২৮ (৬.৩)	৪৪৮ (১০০)
তারতম্য (হ্রাস/বৃদ্ধি)	৯৫ (বৃদ্ধি) (২১.৫) (বৃদ্ধি)	৯০ (বৃদ্ধি) (২৩) (বৃদ্ধি)	১০০ (হ্রাস) (১৪.৮) (হ্রাস)	১৬০ (হ্রাস) (২৯.৭) (হ্রাস)	৭৫ (হ্রাস) (০)

সার্বিক ফলাফল (সারণী-২৭) অনুযায়ী লোপ্র-১৫ (সংবিধানে রাষ্ট্রের নির্বাহী ক্ষমতা বিন্যাস) অধিবেশনে যথেষ্ট ও তার অধিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক (৫৬.৪%) হ্রাস পেয়েছে। প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তার এ ধরনের হ্রাসে লোপ্র-১৪ (রাষ্ট্রের মূলনীতি ও মৌলিক অধিকারসমূহ) দ্বিতীয় সর্বাধিক (৫০%) এবং লোপ্র-২১ (ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলায় সরকারী কর্মকর্তাদের অধিকার ও দায়িত্ব) সর্বনিম্ন (৩৮.৭%)।

প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর গড়ে যথেষ্ট এবং অনেক প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা যথাক্রমে ১৪.৮% ও ২৯.৭ হ্রাস পেয়েছে। অপরদিকে ২১.৫% প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা মোটেও অনুভব করেন না বলে প্রশিক্ষণোত্তর পর্বে উল্লেখ করেছেন। প্রশিক্ষণ পূর্বে এ হার ছিল ২.৩% এবং প্রশিক্ষণোত্তর পর্বে তা বৃদ্ধি পেয়ে ২৩.৮% এ দাঁড়িয়েছে। প্রশিক্ষণ গ্রহণের পরও প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখযোগ্যভাবে (৭৬.২%) বিদ্যমান। তাই সংশ্লিষ্ট উপ-অবয়বের পাঠসূচী এবং প্রশিক্ষণ পদ্ধতির পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন।

সারণী-২৭ ঃ ''সরকারী পদ্ধতি'' উপ-অবয়বের অধিবেশন ভিত্তিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

প্রশিক্ষণ চাহিদা	অধিবেশনভিত্তিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা								
	অধিবেশন কোড (লোপ্র)								
	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১
ক) যথেষ্ট চাহিদা প্রশিক্ষণপূর্ব	৩০ (৫০)	৩১ (৫০.৮)	২৮ (৫১.৮)	২৩ (৪০.৪)	৩০ (৫৪.৫)	২৭ (৪৯)	৩৩ (৫৫)	১৮ (৩০)	১৫ (২৪.৬)
প্রশিক্ষণোত্তর	১৬ (৩২.৭)	১৪ (২৮)	১৩ (২৬)	১৩ (২৬)	১৯ (৩৭.৩)	১৬ (৩২.৭)	১৪ (২৮)	১৫ (৩০.৬)	১৫ (৩০)
তারতম্য (হ্রাস)	১৪ (হ্রাস) (১৭.৩)হ্রাস	১৭ (হ্রাস) (২২.৮)হ্রাস	১৫ (হ্রাস) (২৫.৮)হ্রাস	১০ (হ্রাস) (১৪.৪) বৃদ্ধি	১১ (হ্রাস) (১৭.২)হ্রাস	১১ (হ্রাস) (১৬.৩)হ্রাস	১৯হ্রাস (২৭)হ্রাস	৩ (হ্রাস) (০.৬) বৃদ্ধি	০ (৫.৪) বৃদ্ধি
খ) অনেক চাহিদা প্রশিক্ষণ পূর্ব	২০ (৩৩.৩)	১৯ (৩১.২)	২০ (৩৭)	২০ (৩৫.১)	১৫ (২৭.৩)	১৭ (৩১)	১৫ (২৫)	২৯ (৪৮.০)	৩৩ (৫৪.১)
প্রশিক্ষণোত্তর	২ (৪.১)	২ (৪)	৩ (৬)	৫ (১০)	২ (৩.৯)	৩ (৬.১)	২ (৪)	৪ (৮.২)	৫ (১০)
তারতম্য (হ্রাস/বৃদ্ধি)	১৮ (২৯.২)	১৭ (২৭.২)	১৭ (৩১)	১৫ (২৫.১)	১৩ (২৩.৪)	১৪ (২৪.৯)	১৩ (২১)	২৫ (৪০.২)	২৮ (৪৪.১)
প্রকৃত (Net) তারতম্য (হ্রাস)	৩২ (৪৬.৫)	৩৪ (৫০)	৩২ (৫৬.৪)	২৫ (৩৯.৫)	২৪ (৪০.৬)	২৫ (৪১.২)	৩২ (৪৮)	২৮ (৩৯.৬)	২৮ (৩৮.৭)

সারণী-২৮ অনুযায়ী যথেষ্ট ও তার অধিক প্রশিক্ষণ চাহিদা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ১৯.৫% (২৯৮) হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে। উপ-অবয়বটিতে 'মোটেও না' প্রশিক্ষণ চাহিদা প্রশিক্ষণ পর্বে ৩.৮% থেকে ১৪.৩% এ বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ ১০.৫% প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে উপ-অবয়বটিতে প্রশিক্ষণের চাহিদা রয়েছে বলে মনে করেন না। সার্বিকভাবে এ ফলাফল প্রশিক্ষণের ইতিবাচক ভূমিকা প্রতীয়মান করে। তাবে এখনো এ উপ-অবয়বে ৮৯.৫% প্রশিক্ষণ চাহিদা বিদ্যমান রয়েছে। উপ-অবয়বটির গুরুত্ব (৯৫.১%) এবং প্রয়োজনীয়তা (৯৭.৭) বিবেচনা করে এ উপ-অবয়বের কলেবর, সময়সীমা বৃদ্ধি এবং সৃজনশীল প্রশিক্ষণ পদ্ধতি প্রবর্তন করা প্রয়োজন।

সারণী-২৮ ঃ "সরকারী পদ্ধতি" উপ-অবয়বে প্রশিক্ষণ চাহিদার পরিবর্তন

মতামত	প্রশিক্ষণ চাহিদার পরিবর্তন				
	মোটেও না	সামান্য	যথেষ্ট	অনেক	মোট
ক) প্রশিক্ষণ পূর্ব	৪০ (৩.৮)	১৭৩ (১৬.৫)	৪৬৩ (৪৪.৫)	৩৬৭ (৩৫.২)	১০৪৩ (১০০)
খ) প্রশিক্ষণোত্তর	১২৭ (১৪.৩)	২২৬ (২৫.৫)	৩৪৪ (৩৮.৯)	১৮৮ (২১.৩)	৮৮৫ (১০০)
তারতম্য (হ্রাস/বৃদ্ধি)	৮৭ (বৃদ্ধি) (১০.৫) বৃদ্ধি	৫৩(বৃদ্ধি) (৯) বৃদ্ধি	১১৯ (হ্রাস) (৫.৬) হ্রাস	১৭৯ (হ্রাস) (১৩.৯) বৃদ্ধি	১৫৮ (হ্রাস) (০)

সার্বিকভাবে লোপ্র-১২ (তুলনামুলক সরকার ও বাংলাদেশের সাংবিধানিক বিবর্তন) অধিবেশনে প্রশিক্ষণ চাহিদা সর্বাধিক (২৫.৩%) হ্রাস পেয়েছে। লোপ্র-১৫ (সংবিধানে রাষ্ট্রের নির্বাহী ক্ষমতা বিন্যাস) অধিবেশনের ক্ষেত্রে এ হ্রাস দ্বিতীয় সর্বাধিক (২৪.৪%) এবং লোপ্র-১৬ (জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী ও প্রশাসকের দায়িত্ব) অধিবেশনের ক্ষেত্রে এ হার সর্বনিম্ন (১২.৯%)।

৮.১.৩ উপ-অবয়বঃ কর্মী ব্যবস্থাপনা

সারণী-২৯ এ উপস্থাপিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী গড়ে ৯৯.২% প্রশিক্ষণার্থী কর্মী ব্যবস্থাপনা উপ-অবয়বটি কর্মজীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক বলে মনে করেন, তম্মধ্যে যথেষ্ট ও তার অধিক গুরুত্বপূর্ণের হার ৯০.৪%। ইতঃপূর্বে আলোচিত লোক প্রশাসন বিষয়ের অপর দু'টি উপ-অবয়ব (প্রশাসনে নৈতিকতা ও সরকারী পদ্ধতি) অপেক্ষা কর্মী ব্যবস্থাপনা উপ-অবয়বটি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছে। অন্য কথায় কর্মী ব্যবস্থাপনা উপ-অবয়বটি প্রশিক্ষণার্থীদের কর্মজীবনের জন্য অধিকতর সংগতিপূর্ণ হয়েছে। সংশ্লিষ্ট উপ-অবয়বসমূহের তুলনামূলক চিত্র নিম্নে প্রদর্শিত হ'ল ঃ

ক) কর্মী ব্যবস্থাপনা ৯৯.২%
খ) সরকারী পদ্ধতি ৯৫.১%

গ) প্রশাসনে নৈতিকতা ৯৫.৯%

প্রশিক্ষণ-পূর্ব ও প্রশিক্ষণোত্তর মতামতের ক্ষেত্রে প্রদর্শিত পরিসংখ্যান (সারণী৩১) খুবই সঙ্গতিপূর্ণ । উভয় ক্ষেত্রে এ হার ৯৯.২০% । যথেষ্ট ও তার অধিক গুরুত্বের ক্ষেত্রে সামান্য তারতম্য (০.৯%) রয়েছে (প্রশিক্ষণ পূর্বে ৮৯.৯% এবং প্রশিক্ষণোত্তর পর্বে ৯০.৮%)।

সারণী-২৯ঃ কর্মজীবনে ''কর্মী ব্যবস্থাপনা'' উপ-অবয়বের গুরুত্ব/প্রসাংগিকতা

উপ-অবয়বের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা					
মতামত	মোটেও না	সামান্য	যথেষ্ট	অনেক	মোট
ক) প্রশিক্ষণ পূর্ব	৭ (০.৮)	৮৬ (৯.৩)	৩৫৩ (৩৮)	৪৮১ (৫১.৯)	৯২৭ (১০০)
খ) প্রশিক্ষণোত্তর	৭ (০.৮)	৭৪ (৮.৪)	৩৮২ (৪৩.৩)	৪১৯ (৪৭.৫)	৮৮২ (১০০)
তারতম্য (হ্রাস/বৃদ্ধি)	০ (০)	১২ (হ্রাস) (০.৯) (হ্রাস)	২৯ (বৃদ্ধি) (৫.৩) (বৃদ্ধি)	৬২(হ্রাস) (৪.৪) (হ্রাস)	৪৫ (হ্রাস) (০)

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মী ব্যবস্থাপনা উপ-অবয়বে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা (৯৯.১)% (প্রশিক্ষণ পুর্ব) থেকে ৮০% এ (প্রশিক্ষণোত্তর পর্বে) হ্রাস পেয়েছে। এক্ষেত্রে প্রকৃত হ্রাস ১৯.১% (সারণী-৩০)। অপরদিকে 'যথেষ্ট ও অনেক' প্রশিক্ষণ প্রয়োজনীয়তা ৩৯% হ্রাস পেয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই এ ফলাফল ইতিবাচক।

সারণী-৩০ঃ ''কর্মী ব্যবস্থাপনা'' উপ-অবয়বে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা					
মতামত	মোটেও না	সামান্য	যথেষ্ট	অনেক	মোট
ক) প্রশিক্ষণ পূর্ব	৮ (০.৯)	১২৫ (১৩.৮)	৩৫৯ (৩৯.৬)	৪১৪ (৪৫.৭)	৯০৬ (১০০)
খ) প্রশিক্ষণোত্তর	১৭৪ (২০)	২৯২ (৩৩.৭)	২৭৮ (৩২)	১২৪ (১৪.৩)	৮৬৮ (১০০)
তারতম্য (হ্রাস/বৃদ্ধি)	১৬৬ (বৃদ্ধি) (১৯.১) (বৃদ্ধি)	১৬৭ (বৃদ্ধি) (১৯.৯) (বৃদ্ধি)	৮১ (হ্রাস) (৭.৬) (হ্রাস)	২৯০ (হ্রাস) (৩১.৪) (হ্রাস)	৩৮ (হ্রাস) (০)

সারণী-৩১ অনুযায়ী প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা হ্রাসে লোপ্র-২৭ সর্বাধিক (৪৫.২%), লোপ্র-২২ দ্বিতীয় সর্বাধিক (৪৩.৪%) এবং লোপ্র-৩৩ সর্বনিম্ন (৩৩.৪%)। লোপ্র-৩০ ও লোপ্র-৩১ অধিবেশনে দু'টিতে যথেষ্ট প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস না পেয়ে বরং বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রাথমিকভাবে এ ফলাফল নেতিবাচক মনে হলেও সার্বিকভাবে প্রকৃত ফলাফল নেতিবাচক নয়। অর্থাৎ উক্ত অধিবেশন দু'টিতে অনেক প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা যথাক্রমে ৩৬.১% ও ৩৮.২% হ্রাস পাওয়ায় প্রকৃত হ্রাসের হার ৩৪.১% ও ৩৬.৪%। এ ফলাফল প্রশিক্ষণের ইতিবাচক ভূমিকাকে সমর্থন করে।

সারণী-৩১ ঃ ''কর্মী ব্যবস্থাপনা'' উপ-অবয়বের অধিবেশন ভিত্তিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা (মতামত)	অধিবেশনভিত্তিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা														
	অধিবেশন কোড (লোপ্র)														
	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬
ক) যথেষ্ট প্রয়োজন প্রশিক্ষণ পূর্ব	২৩ (৪৩.৪)	২৪ (৪২.১)	৩২ (৫৭.১)	২৬ (৪৩.৩)	২৪ (৪২.২)	১৯ (৩৩.৩)	১৮ (৩১.৬)	১৯ (৩৩.৪)	১৬ (২৭.১)	১৮ (৩২.৭)	১৮ (৩১.৬)	২৫ (৪৩.৯)	২৪ (৪৩.৬)	২৫ (৪৫.৫)	২৩ (৪০.৪)
প্রশিক্ষণোত্তর	১৯ (৩৪.৫)	২০ (৩৫.৮)	১৯ (৩৪.৫)	১৮ (৩৩.৩)	১৭ (৩০.৯)	১৫ (২৮.৮)	১৬ (২৯.১)	১৫ (২৬.৮)	১৬ (২৯.১)	১৯ (৩৪.৫)	১৭ (৩০.৯)	১৯ (৩৫.৮)	২০ (৩৭)	১৬ (২৯.১)	১৭ (৩১.৫)
তারতম্য (হ্রাস)	৪ (হ্রাস) (৮.৯) (হ্রাস)	৪ (হ্রাস) (৬.৩) (হ্রাস)	১৩ (হ্রাস) (২২.৬) (হ্রাস)	৮ (হ্রাস) (১০) (হ্রাস)	৭ (হ্রাস) (১১.৩) (হ্রাস)	৪° (হ্রাস) (৪.৫) (হ্রাস)	২ (হ্রাস) (২.৫) (হ্রাস)	৪ (হ্রাস) (৬.৬) (হ্রাস)	০ (২) (বৃদ্ধি)	১ (বৃদ্ধি) (১.৮) (বৃদ্ধি)	১ (হ্রাস) (০.৭) (হ্রাস)	৫ (হ্রাস) (৮.১) (হ্রাস)	৪ (হ্রাস) (৬.৬) (হ্রাস)	৯ (হ্রাস) (১৬.৪) (হ্রাস)	৬ (হ্রাস) (৮.৯) (হ্রাস)
খ) অনেক প্রয়োজন প্রশিক্ষণ পূর্ব	২৫ (৪৭.২)	২৭ (৪৭.৪)	১৬ (২৮.৬)	২৩ (৩৮.৪)	২৭ (৪৭.৪)	৩২ (৫৬.১)	৩৩ (৫৭.৮)	৩২ (৫৬.২)	৩২ (৫৪.৩)	২৯ (৫২.৮)	৩০ (৫২.৬)	২২ (৩৮.৬)	২২ (৪০)	১৮ (৩২.৭)	২৮ (৪৯.১)
প্রশিক্ষণোত্তর	৭ (১২.৭)	৮ (১৪.৩)	৮ (১৪.৬)	৫ (৯.৪)	৯ (১৬.৪)	৮ (১৫.৪)	১০ (১৮.২)	১১ (১৯.৬)	১০ (১৮.২)	৮ (১৪.৬)	৮ (১৪.৬)	৭ (১৩.৩)	৫ (৯.৩)	৭ (১২.৭)	৮ (১৪.৮)
তারতম্য (হ্রাস/বৃদ্ধি)	১৮ (৩৪.৫)	১৯ (৩৩.১)	৮ (১৪)	১৮ (২৯)	১৮ (৩১)	২৪ (৪০.৭)	২৩ (৩৯.৬)	২১ (৩৬.৬)	২২ (৩৬.১)	২১ (৩৮.২)	২২ (৩৮.২)	১৫ (২৫.৩)	১৭ (৩০.৭)	১১ (২০)	২০ (৩৪.৩)
প্রকৃত (Net) তারতম্য (হ্রাস)	২২ (৪৩.৪)	২৩ (৩৯.৪)	২১ (৩৬.৬)	২৬ (৩৯)	২৫ (৪২.৩)	২৮ (৪৫.২)	২৫ (৪২.১)	২৫ (৪৩.২)	২২ (৩৪.১)	২০ (৩৬.৪)	২৩ (৩৮.৯)	২০ (৩৩.৪)	২১ (৩৭.৩)	২০ (৩৬.৪)	২৬ (৪৩.২)

সারণী-৩২ অনুযায়ী প্রশিক্ষণোত্তর পর্বে প্রশিক্ষণ চাহিদায় ইতিবাচক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রশিক্ষণ পূর্বে 'যথেষ্ট ও অনেক' প্রশিক্ষণ চাহিদা ৮৭.৭% থেকে ৬৮.৭% এ হ্রাস পেয়েছে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে প্রকৃত হ্রাস ১৯%। অপরদিকে প্রশিক্ষণের 'মোটেও না' চাহিদা ৯.৫% বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ আরো ৯.৫% প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর প্রশিক্ষণ চাহিদা নেই বলে উল্লেখ করেন। উভয় ক্ষেত্রে এ ফলাফল প্রশিক্ষণের ইতিবাচক প্রভাব প্রমাণ করে।

সারণী ৩২ঃ ''কর্মী ব্যবস্থাপনা'' উপ-অবয়বে প্রশিক্ষণ চাহিদার পরিবর্তন

	প্রশিক্ষণ চাহিদা				
মতামত	মোটেও না	সামান্য	যথেষ্ট	অনেক	মোট
ক) প্রশিক্ষণ পূর্ব	১৫ (০.৮)	২১১ (১১.৫)	৭১২ (৩৮.৯)	৮৯৫ (৪৮.৮)	১৮৩৩ (১০০)
খ) প্রশিক্ষণোত্তর	১৮১ (১০.৩০	৩৬৬ (২১)	৬৬০ (৩৭.৭)	৫৪৩ (৩১)	১৭৫০ (১০০)
তারতম্য (হ্রাস/বৃদ্ধি)	১৬৬ (বৃদ্ধি) (৯.৫) (বৃদ্ধি)	১৫৫(বৃদ্ধি) (৯.৫) (বৃদ্ধি)	৫২ (হ্রাস) (১.২) (হ্রাস	৩৫২(হ্রাস) ১৭.৮) (হ্রাস)	৮৩(হ্রাস) (০)

সারণী-৩৩ অনুযায়ী লোপ-২৬ অধিবেশনে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সর্বাধিক ইতিবাচক পরিবর্তন (২৫.৬%) সাধন সম্ভব হয়েছে। এ ক্ষেত্রে লোপ্র-৩৫ এর স্থান দ্বিতীয় সর্বধিক এবং লোপ্র-৩৩ এর স্থান সর্বনিম্নে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে (লোপ্র-২২, ২৩, ২৭, ২৮, ৩০, ৩৪ ও ৩৫) যথেষ্ট প্রশিক্ষণ চাহিদায় নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হলেও সর্বাধিক ফলাফল ইতিবাচক। অর্থাৎ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সার্বিকভাবে লোপ্র-২২এ ১৬.৭%, লোপ্র-২৩এ ১৯.২%, লোপ্র-২৭এ ২১.৪%, লোপ্র-২৮এ ২১.৭%, লোপ্র-৩০ এ ১৬.৮%, লোপ্র-৩৪এ ১৯.৫% এবং লোপ্র-৩৫ এ ১৬.১% প্রকৃত চাহিদা হ্রাস পেয়েছে।

সারণী-৩৩ ঃ "কর্মী ব্যবস্থাপনা" উপ-অবয়বে অধিবেশন ভিত্তিক প্রশিক্ষণ চাহিদার পরিবর্তন

প্রশিক্ষণ চাহিদা	অধিবেশনভিত্তিক প্রশিক্ষণ চাহিদা														
	অধিবেশন কোড (লোপ্র)														
	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬
ক) যথেষ্ট চাহিদা প্রশিক্ষণ পূর্ব	৪৪ (৪০)	৪৬ (৪০)	৬৩ (৫৫.৭)	৫২ (৪৪)	৫০ (৪৩.৫)	৩৬ (৩১.৩)	৩৫ (৩০.৭)	৩৬ (৩১.৫)	৩২ (২৭.৬)	৪১ (৩৬.৩)	৪০ (৩৪.৮)	৫০ (৪৩.৫)	৪৬ (৪০.৭)	৪৫ (৩৯.১)	৪৫ (৩৮.৫)
প্রশিক্ষণোত্তর	৫৩ (৪৭.৩)	৫১ (৪৫.৪)	৫০ (৪৫.৫)	৪৪ (৪০)	৩৭ (৩০)	৩৫ (৩২.১)	৩৫ (৩১.৫)	৩৫ (৩১.৫)	৩৫ (৩১.৫)	৩৮ (৩৪.২)	৩৭ (৩৩.৩)	৪৩ (৩৯.৪)	৫০ (৪৫.৫)	৪৫ (৪১.৩)	৩৭ (৩৪.৬)
তারতম্য (হ্রাস) (বৃদ্ধি)	৯ (বৃদ্ধি) (৭.৩) (বৃদ্ধি)	৫ (বৃদ্ধি) (৫.৪) (বৃদ্ধি)	১৩ (হ্রাস) (১০.২) (হ্রাস)	৮ (হ্রাস) (৪) (হ্রাস)	১৩ (হ্রাস) (১৩.৫) (হ্রাস)	১ (হ্রাস) (০.৮) (বৃদ্ধি)	০ (০.৮) (বৃদ্ধি)	১ (হ্রাস) (০)	৩ (বৃদ্ধি) (৩.৯) (বৃদ্ধি)	৩ (হ্রাস) (২.১) (হ্রাস)	৩ (হ্রাস) (১.৫) (হ্রাস)	৭ (হ্রাস) (৪.১) (হ্রাস)	৪ (বৃদ্ধি) (৪.৮) (বৃদ্ধি)	০ (২.২) (বৃদ্ধি)	৮ (হ্রাস) (৩.৯) (হ্রাস)
খ) অনেক চাহিদা প্রশিক্ষণ পূর্ব	৫১ (৪৬.৪)	৫৭ (৪৯.৬)	৩৩ (২৯.২)	৪৯ (৪১.৬)	৫৮ (৫০.৫)	৭১ (৬১.৭)	৭১ (৬২.২)	৭০ (৬১.৪)	৭০ (৬০.৪)	৫৯ (৫২.২)	৬১ (৫৩)	৪৮ (৪১.৭)	৫১ (৪৫.২)	৪২ (৩৬.৬)	৬৪ (৫৪.৭)
প্রশিক্ষণোত্তর	২৫ (২২.৪)	২৮ (২৫)	২৫ (২২.৭)	৩২ (২৯.১)	৪৩ (৩৮.৪)	৪৩ (৩৯.৫)	৪৪ (৩৯.৭)	৪৪ (৩৯.৭)	৪৪ (৩৯.৭)	৪০ (৩৬.১)	৩৯ (৩৫.২)	৩৫ (৩২.১)	২৩ (২০.৯)	২০ (১৮.৩)	৩৯ (৩৬.৫)
তারতম্য (হ্রাস/বৃদ্ধি)	২৬ (২৪)	২৯ (২৪.৬)	৮ (৬.৫)	১৭ (১২.৫)	১৫ (১২.১)	২৮ (২২.২)	২৭ (২২.৫)	২৬ (২১.৭)	২৬ (২০.৭)	১৯ (১৬.১)	২২ (১৭.৮)	১৩ (৯.৬)	২৮ (২৪.৩)	২২ (১৮.৩)	২৫ (১৮.২)
প্রকৃত (Net) তারতম্য (হ্রাস)	১৭ (১৬.৭)	২৪ (১৯.২)	২১ (১৬.৭)	২৫ (১৬.৫)	২৮ (২৫.৬)	২৯ (২১.৪)	২৭ (২১.৭)	২৭ (২১.৭)	২৩ (১৬.৮)	২২ (১৮.২)	২৫ (১৯.৩)	২০ (১৩.৭)	২৪ (১৯.৫)	২২ (১৬.১)	৩৩ (২২.১)

৮.১.৪ উপ-অবয়ব : আর্থ ব্যবস্থাপনা

প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর আর্থ ব্যবস্থাপনা উপ-অবয়বের গুরুত্ব ও প্রাসংগিকতা অধিকতর অনুভূত হয়েছে। প্রশিক্ষণ পূর্বের এ হার ৯৭.৩% থেকে প্রশিক্ষণোত্তর পর্বে ১.৯% বৃদ্ধি পেয়ে ৯৯.২% এ দাঁড়িয়েছে (সারণী-৩৪)। নিঃসন্দেহে এ পরিসংখ্যান আশাব্যঞ্জক এবং অনুষদ সদস্যবৃন্দ কর্তৃক পাঠক্রম প্রণয়নের সঠিকতা প্রমাণ করে। যথেষ্ট ও তার অধিক গুরুত্বও প্রশিক্ষণোত্তর পর্বে ১১.৩% বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রশিক্ষণোত্তর পর্বে মোট ৯১.২% কর্মকর্তা উপ-অবয়বটি তাঁদের কর্মজীবনের জন্য যথেষ্ট ও তার অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। আর্থ-ব্যবস্থাপনা উপ-অবয়বটি প্রশিক্ষণার্থীদের কর্মজীবনের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত হওয়ায় প্রশিক্ষণ গ্রহণের পরও এর গুরুত্বহ্রাস পায়নি বরং বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই এ উপ-অবয়বটির পাঠ্যসূচি এবং প্রশিক্ষণ পদ্ধতির উন্নয়ন পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন। প্রয়োজনবোধে এ উপ-অবয়বে বিনিয়োজিত সময়সীমাও বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

সারণী-৩৪ঃ কর্মজীবনে ''আর্থ-ব্যবস্থাপনা'' উপ-অবয়বের গুরুত্ব/প্রাসঙ্গিকতা

কর্মজীবনে উপ-অবয়বের গুরুত্ব/প্রাসংগিকতা					
মতামত	মোটেও না	সামান্য	যথেষ্ট	অনেক	মোট
ক) প্রশিক্ষণ পূর্ব	১৭ (২.৭)	১০৯ (১৭.৪)	২৪৯ (৩৯.৭)	২৫২ (৪০.২)	৬২৭ (১০০)
খ) প্রশিক্ষণোত্তর	৪ (০.৮)	৩৯ (৮)	২৫০ (৫১)	১৯৭ (৪০.২)	৪৯০ (১০০)
তারতম্য (হ্রাস/বৃদ্ধি)	১৩ (বৃদ্ধি) (১.৯) (বৃদ্ধি)	৭০ (হ্রাস) (৯.৪) (হ্রাস)	১ (বৃদ্ধি) (১১.৩) (বৃদ্ধি)	৫৫ (হ্রাস) (০)	১১১৭ (০)

সারণী-৩৬ অনুযায়ী আর্থ-ব্যবস্থাপনা উপ-অবয়বে ৯৮.৪% প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন (তম্মধ্যে ৮১% যথেষ্ট বা তার অধিক এবং বাকী ১৭.৪% সামান্য)। অন্য কথায় এ উপ-অবয়বে প্রশিক্ষণার্থীদের ধারণা পযাপ্ত নয়। তাই তারা এ উপ-অবয়বে প্রশিক্ষণ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এ প্রয়োজনীয়তা ২১.৬% হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে তবে যথেষ্ট বা তার অধিক প্রয়োজনীয়তা ৪১.১% হ্রাস পেয়েছে। প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তার এ হ্রাস প্রশিক্ষণের কার্যকারিতা প্রমাণ করে।

সারণী-৩৫ঃ "আর্থ-ব্যবস্থাপনা" উপ-অবয়বে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

	প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা				
মতামত	মোটেও না	সামান্য	যথেষ্ট	অনেক	মোট
ক) প্রশিক্ষণ পূর্ব	১০ (১.৬)	১০৮ (১৭.৪)	২৬২ (৪২.২)	২৪১ (৩৮.৮)	৬২১ (১০০)
খ) প্রশিক্ষণোত্তর	১১৪ (২৩.২)	১৮১ (৩৬.৯)	১২৯ (২৬.৩)	৬৭ (১৩.৬০	৪৯১ (১০০)
তারতম্য (হ্রাস/ বৃদ্ধি)	১০৪ (বৃদ্ধি) (২১.৬) (বৃদ্ধি)	৭৩ (বৃদ্ধি) (১৯.৫) (বৃদ্ধি)	১৩৩ (হ্রাস) (১৫.৯) (হ্রাস)	১৭৪ (হ্রাস) ২৫.২) (হ্রাস)	১৩০ (হ্রাস) (০)

সারণী-৩৬ ঃ ''আর্থ ব্যবস্থাপনা'' উপ-অবয়বে অধিবেশন-ভিত্তিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা	অধিবেশনভিত্তিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা										
	অধিবেশন কোড (লোপ্র)										
	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮
ক) যথেষ্ট প্রয়োজন প্রশিক্ষণ পূর্ব	২৯ (৫০.৯)	২২ (৩৮.৬)	২৩ (৪১.১)	২৭ (৪৭.৪)	২৯ (৫০.৯)	২৩ (৩৯.৭)	২০ (৩৫)	১৯ (৩২.৮)	২২ (৩৮.৬)	২২ (৪২.৪)	২৬ (৪৭.৩)
প্রশিক্ষণোত্তর	২০ (৪৫.৪)	১৩ (২৯.৫)	১০ (২২.৭)	১০ (২২.২)	১০ (২১.৭)	১২ (২৬.৭)	৮ (১৭.৭)	৯ (১৯.৫)	১০ (২৩.৩)	১৫ (৩১.৯)	১২ (২৮.৬)
তারতম্য (হ্রাস)	৯ (৫.৫)	৯ (৯.১)	১৩ (১৮.৪)	১৭ (২৫.২)	১৯ (২৯.২)	১১ (১৩)	১২ (১৭.৩)	১০ (১৩.৩)	১২ (১৫.৩)	৭ (১০.৫)	১৪ (১৮.৭)
খ) অনেক প্রয়োজন প্রশিক্ষণ পূর্ব	১৬ (২৮.১)	২৬ (৪৫.৬)	৩০ (৫৩.৫)	২৩ (৪০.৩)	২১ (৩৬.৮)	২৬ (৪৪.৮)	২৮ (৪৯.২)	২৭ (৪৬.৫)	১৮ (৩১.৬)	১৬ (৩০.৮)	১০ (১৮.২)
প্রশিক্ষণোত্তর	৩ (৬.৮)	৭ (১৫.৯)	৬ (১৩.৬)	৭ (১৫.৬)	৮ (১৭.৪)	৭ (১৫.৫)	৭ (১৫.৬)	৭ (১৫.২)	৬ (১৩.৯)	৩ (৬.৪)	৬ (১৪.২)
তারতম্য (হ্রাস/বৃদ্ধি)	১৩ (২১.৩)	১৯ (২৯.৭)	২৪ (৩৯.৯)	১৬ (২৪.৭)	১৩ (১৯.৪)	১৯ (২৯.৩)	২১ (৩৩.৬)	২০ (৩১.৩)	১২ (১৭.৭)	১৩ (২৪.৪)	৪ (৪)
প্রকৃত (Net) তারতম্য (হ্রাস)	২২ (২৬.৮)	২৮ (৩৮.৮)	৩৭ (৫৮.৩)	৩৩ (৪৯.৯)	৩২ (৪৮.৬)	৩০ (৪২.৩)	৩৩ (৫০.৯)	৩০ (৪৪.৬)	২৪ (৩৩)	২০ (৩৪.৯)	১৮ (২২.৭)

সারণী-৩৬ এ প্রশিক্ষণার্থীদের অধিবেশন-ভিত্তিক যথেষ্ট ও তাঁর অধিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা দেখানো হয়েছে। লোপ্র-৪০ (আয়ন-ব্যয়ন অফিসারের দায়িত্ব ও কর্তব্য) অধিবেশনে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সর্বাধিক প্রয়োজনীয়তা (৫৮.৩%) হ্রাস পেয়েছে। এক্ষেত্রে লোপ্র-৪৪ (ভ্রমণ ভাতা বিধি) দ্বিতীয় সর্বাধিক (৫০.৯%) এবং লোপ্র-৪৮ (আয়কর) সর্বনিম্ন (২২.৭%)। প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা হ্রাসের বা শিক্ষণের এ তারতম্য বিষয়বস্তুর জটিলতা ও প্রাসঙ্গিকতা, প্রশিক্ষণার্থীদের আগ্রহ, এবং প্রশিক্ষণ পদ্ধতির জন্য হতে পারে।

শুধুমাত্র প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনুভুত হলেই প্রশিক্ষণের চাহিদা হয় না। সংশ্লিষ্ট বিষয় সমূহ কর্মজীবনের জন্য প্রাসংগিক ও গুরুত্বপূর্ণও হতে হবে। অর্থাৎ প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ও কর্মজীবনে বিষয় বস্তুর গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতার সমন্বয় প্রশিক্ষণ চাহিদা নির্ভরশীল। সারণী-৩৭-এ আর্থ-ব্যবস্থাপনা উপ-অবয়বের প্রশিক্ষণপূর্ব ও প্রশিক্ষণোত্তর চাহিদা প্রদর্শিত হয়েছে। উক্ত সারণী অনুযায়ী ৯৭.৮% প্রশিক্ষণার্থী আর্থ-ব্যবস্থাপনা উপ-অবয়বে প্রশিক্ষণ চাহিদা রয়েছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। সুতরাং উপ-অবয়বটি গুরুত্বপূর্ণ এবং উক্ত উপ-অবয়বে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তাও বিদ্যমান। প্রশিক্ষণের পর এ চাহিদা মাত্র ৯.৮% হ্রাস পেয়েছে। তবে যথেষ্ট ও তার অধিক চাহিদা ১৫% হ্রাস পেয়েছে। উভয়ক্ষেত্রেই প্রশিক্ষণ চাহিদার এ পরিবর্তন প্রশিক্ষণের ইতিবাচক ভূমিকা প্রতীয়মান করে। তবে, প্রশিক্ষণের পরও উল্লেখযোগ্য চাহিদা বিদ্যমান। তাই প্রশিক্ষণকে একটি অব্যাহত প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

সারণী-৩৭ঃ ''আর্থ ব্যবস্থাপনা' উপ-অবয়বে প্রশিক্ষণ চাহিদার পরিবর্তন

	প্রশিক্ষণ চাহিদা				
মতামত	মোটেও না	সামান্য	যথেষ্ট	অনেক	মোট
ক) প্রশিক্ষণ পূর্ব	২৭ (২.২)	২১৭ (১৭.৩)	৫১১ (৪১)	৪৯৩ (৩৯.৫)	১২৪৮ (১০০)
খ) প্রশিক্ষণোত্তর	১১৮ (১২)	২২০ (২২.৫)	৩৭৯ (৩৮.৬)	২৬৪ (২৬.৯)	৯৮১ (১০০)
তারতম্য (হ্রাস/বৃদ্ধি)	৯১ (বৃদ্ধি) (৯.৮) (বৃদ্ধি)	৩ (বৃদ্ধি) (৫.২) (বৃদ্ধি)	১৩২ (হ্রাস) (২.৪) (হ্রাস)	২২৯ (হ্রাস) (১২.৬) (হ্রাস)	২৬৭ (হ্রাস) (০)

সারণী-৩৮ এ অধিবেশন-ভিত্তিক প্রশিক্ষণ চাহিদার খতিয়ান দেয়া হয়েছে। উক্ত খতিয়ানে প্রতীয়মান হয় যে লোপ্র-৪০ও লোপ্র-৪১ অধিবেশন দু'টিতে প্রশিক্ষণ চাহিদা যথাক্রমে সর্বাধিক (২৭.৪%) ও দ্বিতীয় সর্বাধিক (২৫.১%) হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে। অপরদিকে লোপ্র-৪৮ অধিবেশনে প্রশিক্ষণ চাহিদা সর্বনিম্ন (০.৪%) হ্রাস পেয়েছে। এ হ্রাস অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক। লোপ্র-৪৮ অধিবেশনটি কর্মজীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ (গড়ে ৯৬.৩%) এবং প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা (প্রশিক্ষণ পূর্বে ৯৪.৫%) অনুভূত হওয়া সত্বেও চাহিদায় এ ধরনের প্রভাবের জন্য উপস্থাপনা কৌশল এবং প্রশিক্ষণ পদ্ধতি দায়ী হতে পারে।

সারণী-৩৮ ঃ "আর্থ ব্যবস্থাপনা" উপ-অবয়বে প্রশিক্ষণ চাহিদার পরিবর্তন

প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা	অধিবেশনভিত্তিক প্রশিক্ষণ চাহিদা অধিবেশন কোড (লোপ্র)										
	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮
ক) যথেষ্ট প্রয়োজন প্রশিক্ষণ পূর্ব	৫৪ (৪৯.৫)	৪১ (৩৫.৩)	৪৫ (৩৯.৫)	৫৪ (৪৭)	৫৯ (৫০.৪)	৪৮ (৪২.৫)	৪১ (৩৫.৭)	৩৭ (৩২.২)	৩৯ (৩৩.৯)	৪৫ (৪২)	৪৮ (৪২.৯)
প্রশিক্ষণোত্তর	৪৮ (৫১.৬)	৩৮ (৪২.৭)	২৮ (৩১.৮)	৩০ (৩৩.৭)	৩২ (৩৫.৬)	৩৫ (৪০.২)	২৮ (৩১.৫)	২৮ (৩১.১)	৩৪ (৩৯)	৪১ (৪৫.৬)	৩৭ (৪১.৬)
তারতম্য (হ্রাস/ বৃদ্ধি)	৬ (হ্রাস) (২.১) বৃদ্ধি	৩ (হ্রাস) (৭.৪) বৃদ্ধি	১৭ (হ্রাস) (৭.৭) হ্রাস	২৪ (হ্রাস) (১৩.৩) হ্রাস	২৭ (হ্রাস) (১৪.৮) হ্রাস	১৩ (হ্রাস) (২.৩) হ্রাস	১৩ (হ্রাস) (৪.২) হ্রাস	৯ (হ্রাস) (১.১) হ্রাস	৫ (হ্রাস) (৫.১) বৃদ্ধি	৪ (হ্রাস) (৩.৬) বৃদ্ধি	১১ (হ্রাস) (১.৩) হ্রাস
খ) অনেক প্রয়োজন প্রশিক্ষণ পূর্ব	২৭ (২৪.৮)	৫৬ (৪৮.৩)	৬৪ (৫৬.১)	৪৯ (৪২.৫)	৪৩ (৩৬.৭)	৫২ (৪৬)	৬০ (৫২.১)	৫৫ (৪৭.৮)	৪২ (৩৬.৬)	২৭ (২৫.৩)	১৮ (১৬)
প্রশিক্ষণোত্তর	১৫ (১৬.১)	২৫ (২৮.১)	৩২ (৩৬.৪)	৩০ (৩০.৭)	২৬ (২৮.৯)	২৩ (২৬.৫)	৩১ (৩৪.৯)	৩১ (৩৪.৯)	২২ (২৫.৩)	১৪ (১৫.৬)	১৫ (১৬.৯)
তারতম্য (হ্রাস/বৃদ্ধি)	১২ (হ্রাস) (৮.৭) হ্রাস	৩১ (হ্রাস) (২০.২) হ্রাস	৩২ (হ্রাস) (১৯.৭) হ্রাস	১৯ (হ্রাস) (১১.৮) হ্রাস	১৭ (হ্রাস) (৭.৮) হ্রাস	২৯ (হ্রাস) (১৯.৫) হ্রাস	২৯ (হ্রাস) (১৭.২) হ্রাস	২৪ (হ্রাস) (১২.৯) হ্রাস	২০ (হ্রাস) (১১.৩) হ্রাস	১৩ (হ্রাস) (৯.৭) হ্রাস	৩ (বৃদ্ধি) (০.৯) হ্রাস
প্রকৃত (Net) তারতম্য (হ্রাস)	১৮ (৬.৬)	৩৪ (১২.৮)	৪৯ (২৭.৪)	৪৩ (২৫.১)	৪৪ (২২.৬)	৪২ (২১.৮)	৪২ (২১.৪)	৩৩ (১৪)	২৫ (৬.২)	১৭ (৬.১)	১৪ (০.৪)

৮.১.৫ উপ-অবয়বঃ অফিস ব্যবস্থাপনা

প্রশিক্ষণ পূর্ব এবং প্রশিক্ষণোত্তর উভয় ক্ষেত্রের মতামত অনুযায়ী অফিস ব্যবস্থাপনা উপ-অবয়বটি কর্মজীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। প্রশিক্ষণ পূর্বে ৯৫.৫% এবং প্রশিক্ষণোত্তর পর্বে ৯৮% প্রশিক্ষণার্থী এর স্বপক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন (সারণী-৩৯)। প্রশিক্ষণোত্তর পর্বে উপ-অবয়বটির গুরুত্ব অধিকতর অনুভূত হয়েছে। এ ফলাফল অনুষদ সদস্যবৃন্দ কর্তৃক উপ-অবয়বটির অধিবেশন সমূহ নির্ধারণের কার্যকারিতা প্রমাণ করে।

উপ-অপবয়বটির যথেষ্ট ও তার অধিক গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা গড়ে ৮০.০৭%। প্রশিক্ষণ পূর্বে ৭৬.৪৩% হার প্রশিক্ষণোত্তর পর্বে ৮৫% এ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ফলাফল পাঠক্রম প্রণয়নের কার্যকারিতা সমর্থন করে। অর্থাৎ প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা পাওয়ার পরও প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ উব-অবয়বটির গুরুত্ব স্বীকার করেন। উপরন্তু এ উপ-অবয়বটি প্রশিক্ষণার্থীদের কর্মজীবনের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত বিধায় প্রশিক্ষণ গ্রহণের পরও এর গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই এ উপ-অবয়বটির পরিধি আরো বৃদ্ধি করা যায়। প্রশিক্ষণ পদ্ধতিও প্রয়োজনবোধে পুনর্বিন্যাস করা যেতে পারে।

সারণী-৩৯ঃ কর্মজীবনে "অফিস ব্যবস্থাপনা" উপ-অবয়বের গুরুত্ব/প্রাসঙ্গিকতা

	কর্মজীবনে উপ-অবয়বের গুরুত্ব/প্রাসঙ্গিকতা				
মতামত	মোটেও না	সামান্য	যথেষ্ট	অনেক	মোট
ক) প্রশিক্ষণ পূর্ব	৩৪ (৪.৫)	১৪৭ (১৯.২)	৩১৫ (৪১.৩)	২৬৮ (৩৫)	৭৬৪ (১০০)
খ) প্রশিক্ষণোত্তর	১১ (২)	৭৪ (১৩)	২৭৩ (৪৮)	২১০ (৩৭)	৫৬৮ (১০০)
তারতম্য (হ্রাস/ বৃদ্ধি)	২৩(হ্রাস) (২.৫) (হ্রাস)	৭৩(হ্রাস) (৬.২) (হ্রাস)	৪২(হ্রাস) (৬.৭) (বৃদ্ধি)	৫৮(হ্রাস) (২) (বৃদ্ধি)	১৯৬(হ্রাস) (০)

প্রশিক্ষণের পূর্বে ৯৭.১% প্রশিক্ষণার্থী অফিস ব্যবস্থাপনা উপ-অবয়বে প্রশিক্ষণ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন (সারণী-৪০) অর্থাৎ উক্ত উপ-অবয়ব সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের ধারণা পর্যাপ্ত নয়। প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে এ প্রয়োজনীয়তা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। ২৭% প্রশিক্ষণার্থী উক্ত উপ-অবয়বে প্রশিক্ষণ গ্রহণের প্রয়োজন অনুভব করেন না। এ হার প্রশিক্ষণোত্তর পর্বে ৪৩.৯% হ্রাস পেয়েছে। প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তার এ পরিবর্তন প্রশিক্ষণের ইতিবাচক প্রভাব প্রতীয়মান করে।

সারণী-৪০ঃ ''অফিস ব্যবস্থাপনা'' উপ-অবয়বের প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

	প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা				
মতামত	মোটেও না	সামান্য	যথেষ্ট	অনেক	মোট
ক) প্রশিক্ষণ পূর্ব	২২ (২.৯)	১৬০ (২১.৪)	৩১০ (৪১.৪)	২৫৭ (৩৪.৩)	৭৩৯ (১০০)
খ) প্রশিক্ষণোত্তর	১৫৪ (২৭)	২৩৬ (৪১.২)	১১৯ ২০.৮)	৬৩ (১১)	৫৭২ (১০০)
তারতম্য (হ্রাস/ বৃদ্ধি)	১৩২(বৃদ্ধি) (২৪.১) (বৃদ্ধি)	৭৬ (বৃদ্ধি) (১৯.৮) (বৃদ্ধি)	১৯১(হ্রাস) ২০.৬) (হ্রাস)	১৯৪(হ্রাস) (২৩.৩) (হ্রাস)	১৬৭(হ্রাস) (০)

অধিবেশন-ভিত্তিক পরিসংখ্যানে (সারণী-৪১) লোপ্র-৪৯ (নথি ব্যবস্থাপনা) অধিবেশনটি প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক (৬০%) হ্রাস পেয়েছে। লোপ্র-৫০ (নোট লিখন) অধিবেশনটি এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় সর্বাধিক (৫৭.৮) এবং লোপ্র-৬০ (প্রকাশনা বিধি, পদ্ধতি ও প্রয়োগ) সর্বনিম্ন (২৭.৬%)। আর্থ-ব্যবস্থাপনা উপ-অবয়ব অপেক্ষা এ উপ-অবয়বে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অধিকতর হ্রাস পেয়েছে। এদিক থেকে অফিস ব্যবস্থাপনা উপ-অবয়বটি অধিকতর কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে।

সারণী-৪১ ঃ ''অফিস ব্যবস্থাপনা'' উপ-অবয়বে অধিবেশন-ভিত্তিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা	অধিবেশনভিত্তিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা												
	অধিবেশন কোড (লোপ্র)												
	৪৯	৫০	৫১	৫২	৫৩	৫৪	৫৫	৫৬	৫৭	৫৮	৫৯	৬০	৬১
ক) যথেষ্ট প্রয়োজন প্রশিক্ষণ পূর্ব	১৬ (২৮.৬)	২০ (৩৫.৭)	২৫ (৪৩.১)	২৬ (৪৪.৮)	২৮ (৪৮.৩)	২৬ (৪৫.৬)	৩১ (৫২.৫)	২৮ (৪৭.৫)	২৪ (৪২.১)	২১ (৩৬.২)	২৪ (৪১.৪)	২৬ (৪৪.৮)	১৫ (২৬.৩)
প্রশিক্ষণোত্তর	৫ (১২.৮)	৭ (১৫.৬)	৭ (১৫.৬)	৮ (১৭.৮)	৭ (১৬.৩)	৮ (১৮.২)	১১ (২৫.৬)	১২ (২৭.৩)	১০ (২২.২)	১১ (২৫)	১১ (২৪.৪)	১২ (২৬.৭)	১০ (২২.২)
তারতম্য (হ্রাস)	১১ (১৫.৮)	১৩ (২০.১)	১৮ (২৭.৫)	১৮ (২৭)	২১ (৩২)	১৮ (২৭.৪)	২০ (২৬.৯)	১৬ (২০.২)	১৪ (১৯.৯)	১০ (১১.২)	১৩ (১৭)	১৪ (১৮.১)	৫ (৪.১)
খ) অনেক প্রয়োজন প্রশিক্ষণ পূর্ব	৩২ (৫৭.১)	২৬ (৪৬.৫)	১৯ (৩২.৮)	১৫ (২৫.৯)	১৩ (২২.৪)	২০ (৩৫.১)	২০ (৩৩.৯)	১৮ (৩০.৫)	১৮ (৩১.৬)	২০ (৩৪.৫)	১৬ (২৭.৬)	১২ (২০.৭)	২৮ (৪৯.১)
প্রশিক্ষণোত্তর	৫ (১২.৯)	৪ (৮.৮)	৫ (১১.১)	৫ (১১.১)	৪ (৯.২)	৬ (১৩.৬)	৫ (১১.৬)	৫ (১১.৪)	৪ (৮.৯)	৪ (৯.১)	৬ (১৩.৪)	৫ (১১.১)	৫ (১১.১)
তারতম্য (হ্রাস/বৃদ্ধি)	২৭ (৪৪.২)	২২ (৩৭.৭)	১৪ (২১.৭)	১০ (১৪.৮)	৯ (১৩.২)	১৪ (২১.৫)	১৫ (২২.৩)	১৩ (১৯.১)	১৪ (২২.৭)	১৬ (২৫.৪)	১০ (১৪.২)	৭ (৯.৬)	২৩ (৩৮)
প্রকৃত (Net) তারতম্য (হ্রাস)	৩৮ (৬০)	৩৫ (৫৭.৮)	৩২ (৪৯.২)	২৮ (৪১.৮)	৩০ (৪৫.২)	৩২ (৪৮.৯)	৩৫ (৪৯.২)	২৯ (৩৯.৩)	২৮ (৪২.৬)	২৬ (৩৬.৬)	২৩ (৩১.২)	২১ (২৭.৭)	২৮ (৪২.১)

অফিস ব্যবস্থাপনা উপ-অবয়বে প্রশিক্ষণ চাহিদা হ্রাসে ইতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রশিক্ষনোত্তর পর্বে ১৪.৫% প্রশিক্ষনার্থী প্রশিক্ষণ চাহিদা নেই বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন (সারণী-৪২)। এ পরিসংখ্যান প্রশিক্ষণ পূর্ব অপেক্ষা ১০.৮% বেশী। অপরদিকে 'যথেষ্ট' ও তার অধিক প্রশিক্ষণ চাহিদাও প্রশিক্ষণোত্তর পর্বে ১৭.৭% হ্রাস পেয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই এ হার প্রশিক্ষণের ইতিবাচক প্রভাব প্রতীয়মান করে।

সারণী-৪২ঃ "অফিস ব্যবস্থাপনা" উপ-অবয়বে প্রশিক্ষণ চাহিদার পরিবর্তন

	প্রশিক্ষণ চাহিদা						
মতামত	মোটেও না	সামান্য	মোট	যথেষ্ট	অনেক	মোট	সর্বমোট
ক) প্রশিক্ষণ পূর্ব	৫৬ (৩.৭)	৩০৭ (২০.৩)	৩৬৩ (২৪)	৬২৫ (৪১.৩)	৫২১৫ (৩৪.৭)	১১৫০ (৭৬	১৫১০ (১০০)
খ) প্রশিক্ষণোত্তর	১৬৫ (১৪.৫)	৩১০ (২৭.২)	৪৭৫ (৪১.৭)	৩৯২ (৩৪.৪)	২৭৩ (২৩.৯)	৬৬৫ (৫৮.৩)	১১৪০ (১০০)
তারতম্য (হ্রাস/ বৃদ্ধি)	১০৯(বৃদ্ধি) (১০.৮) (বৃদ্ধি)	৩ (বৃদ্ধি) (৬.৯) (বৃদ্ধি)	১১২(বৃদ্ধি) ৯১.৭) (বৃদ্ধি)	২৩৩(হ্রাস) (৬.৯) (হ্রাস)	২৫২(হ্রাস) (১০.৮) (হ্রাস)	৪৮৫(হ্রাস) (১৭.৭) (হ্রাস)	৩৭০(হ্রাস) (০)

অধিবেশন ভিত্তিক প্রশিক্ষণ চাহিদা হ্রাসে (সারণী-৪৩) লোপ্র-৫১(নোট লিখন অনুশীলনী) সর্বাধিক (২৭.৪) লোপ্র-৫০ (নোট লিখন) দ্বিতীয় সর্বাধিক (২৪.৭%) এবং লোপ্র-৫৯ (যানবাহন নীতিমালা) সর্বনিম্ন (১.১%)।

প্রশিক্ষণের যথেষ্ট চাহিদা কোন কোন ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পেলেও (লোপ্র-৪৯, ৫৯, ৬১) সার্বিক ফলাফল ইতিবাচক।

সারণী-৪৩ ঃ ''অফিস ব্যবস্থাপনা'' উপ-অবয়বে অধিবেশন-ভিত্তিক প্রশিক্ষণ চাহিদার পরিবর্তন

প্রশিক্ষণের চাহিদা	অধিবেশনভিত্তিক প্রশিক্ষণ চাহিদা												
	অধিবেশন কোড (লোপ্র)												
	৪৯	৫০	৫১	৫২	৫৩	৫৪	৫৫	৫৬	৫৭	৫৮	৫৯	৬০	৬১
ক) যথেষ্ট প্রয়োজন প্রশিক্ষণ পূর্ব	৩৪ (২৯.৩)	৩৬ (৩১.৩)	৫৩ (৪৪.৯)	৫১ (৪২.৯)	৫৫ (৪৭)	৫৪ (৪৭.৪)	৬১ (৫২.৬)	৫৫ (৪৭)	৪৭ (৪০.৯)	৪৬ (৪০)	৪৭ (৪০.৫)	৪৯ (৪১.৫)	৬৭ (৬১)
প্রশিক্ষণোত্তর	২৪ (৩১.৬)	২২ (২৪.৫)	২৪ (২৬.৭)	২৮ (৩১.১)	৩৩ (৩৭.৯)	৩২ (৩৬)	৩১ (৩৫.২)	৩৩ (৩৬.৭)	৩৫ (৩৮.৯)	২৭ (৩০.৩)	৩৬ (৪০.৯)	৩২ (৩৭.২)	৩৫ (৪০.২)
তারতম্য (হ্রাস/ বৃদ্ধি)	১০ (হ্রাস) (২.৩) বৃদ্ধি	১৪ (হ্রাস) (৬.৮) হ্রাস	২৯ (হ্রাস) (১৮.২) হ্রাস	২৩ (হ্রাস) (১১.৮) হ্রাস	২২ (হ্রাস) (৯.১) হ্রাস	২২(হ্রাস) (১১.৪) হ্রাস	৩০ (হ্রাস) (১৭.৪) হ্রাস	২২ (হ্রাস) (১০.৩) হ্রাস	১২ (হ্রাস) (২) হ্রাস	১৯ (হ্রাস) (৯.৭) হ্রাস	১১ (হ্রাস) (০.৪) বৃদ্ধি	১৭ (হ্রাস) (৪.৩) হ্রাস	২ হ্রাস (৮.৬) বৃদ্ধি
খ) অনেক চাহিদা প্রশিক্ষণ পূর্ব	৬৪ (৫৫.২)	৫৫ (৪৭.৯)	৪১ (৩৪.৮)	৩৩ (২৭.৭)	২৯ (২৪.৮)	৪০ (৩৫.১)	৩৯ (৩৩.৬)	৩৬ (৩০.৮)	৩৫ (৩০.৫)	৩৯ (৩৩.৯)	৩১ (২৬.৫)	২৬ (২২.১)	৫৭ (৪৮.৭)
প্রশিক্ষণোত্তর	২৩ (৩০.৩)	২৭ (৩০)	২৩ (২৫.৬)	২১ (২৩.৪)	১৬ (১৮.৪)	২৩ (২৫.৮)	২৬ (২৯.৬)	১৮ (২০)	১৯ (২১.১)	২১ (২৩.৬)	২২ (২৫)	১৫ (১৭.৫)	১৯ (২১)
তারতম্য (হ্রাস/বৃদ্ধি)	৪১ (২৪.৯)	২৮ (১৭.৯)	১৮ (৯.২)	১২ (৪.৩)	১৩ (৬.৪)	১৭ (৯.৩)	১৩ (১)	১৮ (১০.৮)	১৬ (৯.৪)	১৮ (১০.৩)	৯ (১.৫)	১১ (৪.৬)	৩৮ (২৬)
প্রকৃত (Net) তারতম্য (হ্রাস)	৫১ (২২.৬)	৪২ (২৪.৭)	৪৭ (২৭.৪)	৩৫ (১৬.১)	৩৫ (১৫.৫)	৩৯ (২০.৭)	৪৩ (১৮.৪)	৪০ (২১.১)	২৮ (১১.৪)	৩৭ (২০)	২০ (১.১)	২৮ (৮.৯)	৪০ (১৮)

৮.১.৬ উপ-অবয়ব : প্রশাসনিক যোগাযোগ

প্রশিক্ষণ পূর্ব ও প্রশিক্ষণোত্তর উভয় ক্ষেত্রেই প্রশাসনিক যোগাযোগ উপ-অবয়বটি প্রশিক্ষণার্থীদের কর্মজীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসংগিক হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছে। প্রশিক্ষণ পূর্বে এ হার ৯৭% এবং প্রশিক্ষণোত্তর পর্বে এ হার বৃদ্ধি পেয়ে ৯৮% হয়েছে (সারণী-৪৪)। অর্থাৎ প্রশিক্ষণোত্তর পর্বে প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ উপ-অবয়বটির গুরুত্ব অধিকতর উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন। যথেষ্ট ও তার অধিক গুরুত্বের হার প্রশিক্ষণ পূর্বে ৮০.৫% থেকে প্রশিক্ষণোত্তর পর্বে ৮৫% এ দাঁড়িয়েছে। এহেন পরিসংখ্যান বিশেষজ্ঞ অনুষদ কর্তৃক প্রণীত পাঠক্রমের সঠিকতা ও কার্যকারিতা প্রমাণ করে।

সারণী-৪৪ কর্মজীবনে ''প্রশাসনিক যোগযোগ'' উপ-অবয়বে গুরুত্ব/ প্রাসঙ্গিকতা

	কর্মজীবনে উপ-অবয়বের গুরুত্ব/প্রাসঙ্গিকতা				
মতামত	মোটেও না	সামান	যথেষ্ট	অনেক	মোট
ক) প্রশিক্ষণ পূর্ব	১৭ (৩)	৯১ (১৬.৫)	২১২ (৩৮.৩)	২৩৩ (৪২.২)	৫৫৩ (১০০)
খ) প্রশিক্ষণোত্তর	১০ (২)	৬৪ (১৩)	২২২ (৪৫.১)	১৯৬ (৩৯.৯)	৪৯২ (১০০)
তারতম্য (হ্রাস/বৃদ্ধি)	৭ (হ্রাস) (১) (হ্রাস)	২৭ (হ্রাস) (৩.৫) (হ্রাস)	১০ (বৃদ্ধি) (৬.৮) (বৃদ্ধি)	৩৭ (হ্রাস) (২.৩) (হ্রাস)	৬১ (হ্রাস) (০) (হ্রাস)

প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে ১৫.৪% প্রশিক্ষণার্থী প্রশাসনিক যোগাযোগ উপ-অবয়বে প্রশিক্ষণ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না (সারণী-৪৫)। প্রশিক্ষণ পূর্বে এ হার ছিল ৪%। অর্থাৎ প্রশিক্ষণের ফলে এ হার ১১.৪% বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরদিকে যথেষ্ট ও তাঁর অধিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তাও প্রশিক্ষণোত্তর পর্বে ২৯.১% হ্রাস পেয়েছে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষণের ফলে প্রয়োজনীয়তায় এ ইতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। এ পরিসংখ্যান প্রশিক্ষণের কার্যকারিতা প্রমাণ করে।

সারণী-৪৫ঃ ''প্রশাসনিক যোগাযোগ'' উপ-অবয়বে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

	প্রশিক্ষনের প্রয়োজনীয়তা				
মতামত	মোটেও না	সামান্য	যথেষ্ট	অনেক	সর্বমোট
ক) প্রশিক্ষণ পূর্ব	২২ (৪)	৯১ (১৬.৪)	২২৪ (৪০.৪)	৬২১৭ (৩৯.২)	৫৫৪ ৯১০০)
খ) প্রশিক্ষণোত্তর	৭৭ (১৫.৪০)	১৭১ (৩৪.১)	১৮৩ (৩৬.৫)	৭০ (১৪)	৫০১ (১০০)
তারতম্য (হ্রাস/বৃদ্ধি)	৫৫ (বৃদ্ধি) (১১.৪) (বৃদ্ধি)	৮০ (বৃদ্ধি) (১৭.৭) (বৃদ্ধি)	৪১ (হ্রাস) (৩.৯) (হ্রাস)	১৪৭ (হ্রাস) (২৫.২) (হ্রাস)	৫৩ (০)

সার্বিকভাবে লোপ্র-৬৩ অধিবেশনে (সরকারী চিঠিপত্র লিখন অনুশীলনী) সর্বাধিক (৪৫.৫%) প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পেয়েছে (সারণী৪৬)। এ ক্ষেত্রে লোপ্র ৬২ (সরকারী চিঠিপত্র লিখন) দ্বিতীয় সর্বাধিক (৪০.৫%) এবং লোপ্র-৬৮(অফিস পরিদর্শন) সর্বনিম্ন (১৪%)। যথেষ্ট প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা কিছু কিছু ক্ষেত্রে (লোপ্র-৬৪, ৬৫, ৬৭, ৬৮, ও ৬৯) বৃদ্ধি পেলেও সার্বিক ফলাফল ইতিবাচক।

সারণী-৪৬ ঃ ''প্রশাসনিক যোগাযোগ'' উপ-অবয়বে অধিবেশন ভিত্তিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা	অধিবেশনভিত্তিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা									
	অধিবেশন কোড (লোপ্র)									
	৬২	৬৩	৬৪	৬৫	৬৬	৬৭	৬৮	৬৯	৭০	৭১
ক) যথেষ্ট প্রয়োজন প্রশিক্ষণ পূর্ব	২১ (৩৫.৬)	২৬ (৪৫.৬)	২২ (৩৭.৯)	২৩ (৩৯.৭)	২২ (৩৭.৯)	১৯ (৩১.৭)	২২ (৩৭.৩)	১৩ (৪১.৯)	২৪ (৪২.১)	২০ (৩৫.৭)
প্রশিক্ষণোত্তর	১৬ (৩২.৭)	১৭ (৩৩.৩)	২৭ (৫৪)	২২ (৪৪)	১৯ (৩৮)	২০ (৪০)	১৮ (৩৬)	১৬ (৩২.৭)	১৪ (২৬.৯)	১৪ (২৮)
তারতম্য (হ্রাস/ বৃদ্ধি)	৫ (হ্রাস) (২.৯)হ্রাস	৯ (হ্রাস) (১২.৩)হ্রাস	৫ (বৃদ্ধি) (১৬.১) বৃদ্ধি	১ (হ্রাস) (৪.৩) বৃদ্ধি	৩ (হ্রাস) (০.১) বৃদ্ধি	১ (বৃদ্ধি) (৮.৩) বৃদ্ধি	৪ (হ্রাস) (১.৩)হ্রাস	৩ (বৃদ্ধি) (৯.২)হ্রাস	১০ (হ্রাস) (১৫.২)হ্রাস	৬ (হ্রাস) (৭.৭)হ্রাস
খ) অনেক প্রয়োজন প্রশিক্ষণ পূর্ব	৩৩ (৫৫.৯)	২৯ (৫০.৯)	২৪ (৪১.৪)	২৪ (৪১.৪)	২৩ (৩৯.৭)	২৯ (৪৮.৩)	২২ (৩৭.৩)	৮ (২৫.৮)	১৬ (২৮)	২৫ (৪৪.৭)
প্রশিক্ষণোত্তর	৯ (১৮.৩)	৯ (১৭.৭)	২ (৪)	২ (৪)	৪ (৮)	৬ (১২)	১১ (২২)	৭ (১৪.৩)	৯ (১৭.৩)	১১ (২২)
তারতম্য (হ্রাস/বৃদ্ধি)	২৪ (৩৭.৬)	২০ (৩৩.২)	২২ (৩৭.৪)	২২ (৩৭.৪)	১৯ (৩১.৭)	২৩ (৩৬.৩)	১১ (১৫.৩)	১ (১১.৫)	৭ (১০.৭)	১৪ (২২.৭)
প্রকৃত (Net) তারতম্য (হ্রাস)	২৯ (হ্রাস) (৪০.৫)হ্রাস	২৯ (হ্রাস) (৪৫.৫)হ্রাস	১৭ (হ্রাস) (২১.৩)হ্রাস	২৩ (হ্রাস) (৩৩.১)হ্রাস	২২ (হ্রাস) (৩১.৮)হ্রাস	২২ (হ্রাস) (২৮)হ্রাস	১৫ (হ্রাস) (১৪)হ্রাস	২ (বৃদ্ধি) (২০.৭)হ্রাস	১৭ (হ্রাস) (২৫.৯)হ্রাস	২০হ্রাস (৩০.৪)হ্রাস

প্রশিক্ষণোত্তর পর্বে ৮..৭% প্রশিক্ষণার্থী প্রশাসনিক যোগাযোগ উপ-অবয়বে চাহিদা নেই বলে উল্লেখ করেন (সারণী-৪৭)। প্রশিক্ষণ পূর্বে এ হার ৩.৫% ছিল। যথেষ্ট বা তার অধিক চাহিদাও প্রশিক্ষণোত্তর পর্বে ১২.৫% হ্রাস পেয়েছে (সারণী-৪৭)। উভয় ক্ষেত্রেই এ ফলাফল প্রশিক্ষণের ইতিবাচক ভূমিকা প্রতীয়মান করে।

সারণী-৪৭ঃ ""প্রশাসনিক যোগাযোগ"" উপ-অবয়বে প্রশিক্ষণ চাহিদার পরিবর্তন

মতামত	প্রশিক্ষণ চাহিদা				
	মোটেও না	সামান্য	যথেষ্ট	অনেক	মোট
ক) প্রশিক্ষণ পূর্ব	৩৯ (৩.৫)	১৮২ (১৬.৪)	৪৩৬ (৩৯.৪)	৪৫০ (৪০..৭)	১১০৭ (১০০)
খ) প্রশিক্ষণোত্তর	৮৭ (৮..৭)	২৩৫ (২৩.৭)	৪০৫ (৪০.৮)	২৬৬ (২৬.৮)	৯৯৩ (১০০)
তারতম্য (হ্রাস/ বৃদ্ধি:)	৪৮ (বৃদ্ধি) (৫.২) (বৃদ্ধি)	৫৩ (বৃদ্ধি) (৭.৩) (বৃদ্ধি)	৩১ হ্রাস (১.৪) (বৃদ্ধি)	১৮৪ হ্রাস (১৩.৯) (হ্রাস)	১১৪ হ্রাস (০)

সার্বিকভাবে লোপ্র-৬৩ অধিবেশনে (সরকারী চিঠিপত্র লিখন অনুশীলন) সর্বাধিক (২২.৭%) চাহিদা হ্রাস পেয়েছে (সারণী-৪৮)। এ ক্ষেত্রে লোপ্র-৬২ (সরকারী চিঠিপত্র লিখন) দ্বিতীয় সর্বাধিক (১৮%) এবং লোপ্র-৭০ (সরকারী কর্মকর্তাদের ও গণপ্রতিনিধিদের পারস্পরিক সম্পর্ক) সর্বনিম্ন (২..৭%) প্রশিক্ষণের যথেষ্ট চাহিদায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে নেতিবাচক (লোপ্র-৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ও ৬৯) ফলাফল প্রদর্শন করলেও সার্বিক ফলাফল নেতিবাচক নয়। অনেক প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অধিকতর হ্রাস পাওয়ায় সার্বিক ফলাফল ইতিবাচক প্রতীয়মান হয়।

সারণী-৪৮ : ''প্রশাসনিক যোগাযোগ'' উপ-অবয়বে অধিবেশন ভিত্তিক প্রশিক্ষণ চাহিদা

প্রশিক্ষণ চাহিদা	অধিবেশনভিত্তিক প্রশিক্ষণ চাহিদা									
	অধিবেশন কোড (লোপ্র)									
	৬২	৬৩	৬৪	৬৫	৬৬	৬৭	৬৮	৬৯	৭০	৭১
ক) যথেষ্ট চাহিদা প্রশিক্ষণ পূর্ব	৪২ (৩৫.৯)	৪৯ (৪২.৬)	৫২ (৪৪.৮)	৪৭ (৪০.৫)	৪৮ (৪১)	৪৬ (৩৮.৭)	৪৫ (৩৮.৫)	২৩ (৩৭.৭)	৪৮ (৪২.১)	৩৬ (৩১.৩)
প্রশিক্ষণোত্তর	৩৩ (৩৩.৩)	৩২ (৩১.৭)	৫২ (৫২.৫)	৫২ (৫৩.১)	৪১ (৪১.৮)	৪৬ (৪৬)	৩৬ (৩৬.৪)	৪৪ (৪৪.৯)	৩৭ (৩৬.৬)	৩২ (৩২)
তারতম্য (হ্রাস/বৃদ্ধি)	৯ (হ্রাস) (২.৬) হ্রাস	১৭ (হ্রাস) (১০.৯) হ্রাস	০ (৭.৭) বৃদ্ধি	৫ (বৃদ্ধি) (১২.৬) বৃদ্ধি	৭ (হ্রাস) (০.৮) বৃদ্ধি	০ (৭.৩) বৃদ্ধি	৯ (হ্রাস) (২.১) হ্রাস	২১ (বৃদ্ধি) (৭.২) বৃদ্ধি	১১ (হ্রাস) (৫.৫) হ্রাস	৪ (হ্রাস) (০.৭) বৃদ্ধি
খ) অনেক চাহিদা প্রশিক্ষণ পূর্ব	৬৩ (৫৩.৮)	৫৮ (৫০.৪)	৪৩ (৩৭.১)	৪৭ (৪০.৫)	৪৩ (৩৬.৮)	৫২ (৪৩.৭)	৪৬ (৩৯.৩)	১৬ (২৬.২)	৩১ (২৭.২)	৫১ (৪৪.৩)
প্রশিক্ষণোত্তর	৩৮ (৩৮.৪)	৩৯ (৩৮.৬)	১৯ (১৯.২)	১৪ (১৪.২)	২২ (২২.৫)	২৩ (২৩)	৩৭ (৩৭.৩)	১৬ (১৬.৩)	২৪ (২৩.৮)	৩৪ (৩৪)
তারতম্য (হ্রাস/বৃদ্ধি)	২৫ (১৫.৪)	১৯ (১১.৮)	২৪ (১৭.৯)	৩৩ (২৬.৩)	২১ (১৪.৩)	২৯ (২০.৭)	৯ (২)	০ (৯.৯)	৭ (৩.৪)	১৭ (১০.৩)
প্রকৃত (Net) তারতম্য (হ্রাস/বৃদ্ধি)	৩৪ (১৮)	৩৬ (২২.৭)	২৪ (১০.২)	২৮ (১৩.৭)	২৮ (১৩.৫)	২৯ (১৩.৪)	১৮ (৪.১)	২১ (বৃদ্ধি) (২.৭)	১৮ (২.১)	২১ (৯৬)

৮.১.৭ জ্ঞান, দক্ষতা এবং দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনে লোক প্রশাসন

সার্বিকভাবে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের জ্ঞান, দক্ষতা এবং দৃষ্টিভঙ্গীর উপর কোন ইতিবাচক প্রভাব পড়ে কিনা সে সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণার্থীদের মতামত চাওয়া হয়েছিল। তাদের মতামতে প্রতীয়মান হয় যে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে গড়ে ৯৮.৪% প্রশিক্ষণার্থীর লোক প্রশাসন বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতার উন্নয়ন হয়েছে (১৪.% সামান্য, ৬৯% যথেষ্ট এবং ১৫% অনেক)। গড়ে যথেষ্ট বা তার অধিক জ্ঞান ও দক্ষতার উন্নয়নের হার ৮৪%। দৃষ্টিভঙ্গীর উন্নয়নেও লোক প্রশাসন বিষয় খুবই উপযোগী বিবেচিত হয়েছে। গড়ে ৯৮.৯% প্রশিক্ষণার্থী মনে করেন যে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে লোক প্রশাসন বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের দৃষ্টিভঙ্গীর ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে (১১.৪% সামান্য, ৬৮.৫% যথেষ্ট এবং ১৯% অনেক)।

জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গীর উন্নয়নে লোক প্রশাসন বিষয়ের সকল উপ-অবয়বের অবদান খুব কাছাকাছি। জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গীর এহেন পরিবর্তনে লোক প্রশাসন উপ-অবয়ব-২ এর অবদান সর্বাধিক (১০০%) হলেও অন্যান্য উপ-অবয়বের অবদান খুব কম নয়। সকল ক্ষেত্রেই এ হার ৯৫% এর অধিক।

পরবর্তী সংখ্যায় উন্নয়ন অর্থনীতি বিষয়ে আলোকপাত করা হবে। এ ছাড়াও সম্ভব হলে সংশ্লিষ্ট সংখ্যায় সকল বিষয়ের সার্বিক বিশ্লেষণসহ প্রবন্ধের সুপারিশমালা ও উপসংহার অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

মূল্যায়নমূলক এই প্রবন্ধটি বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পাঠক্রমের উপর পরিচালিত

সারণী-৪৯ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে লোক প্রশাসন বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন

লোক প্রশাসন উপ-অবয়ব	প্রশিক্ষণের মাধ্যমে (প্রশিক্ষণোত্তর মতামত)									
	জ্ঞান ও দক্ষতার উন্নয়ন					দৃষ্টিভঙ্গীর (Attitude) উন্নয়ন				
	মোটেও না	সামান্য	যথেষ্ট	অনেক	মোট	মোটেও না	সামান্য	যথেষ্ট	অনেক	মোট
উপ-অবয়ব-১	১৩ (২.৩)	৬২ (১১)	৪১০ (৭২.৭)	৭৯ (১৪)	৫৬৪ (১০০)	১৪ (২.৫)	৬১ (১০.৯)	৪০৮ (৭২.৯)	৭৭ (১৩.৭)	৫৬০ (১০০)
উপ-অবয়ব-২	০ (০)	৭০ (১৫.৫)	৩৩২ (৭৩.৮)	৪৮ (১০.৭)	৪৫০ (১০০)	০ (০)	৪১ (৯.২)	৩২১ (৭২.৫)	৮১ (১৮.৩)	৪৪৩ (১০০)
উপ-অবয়ব-৩	১ (০.১)	৭০ (৮.৪)	৬০৬ (৭২.৭)	১৫৭ (১৮.৮)	৮৩৪ (১০০)	১ (০.১)	৪১ (৫.৪)	৫৫০ (৭২.৬)	১৬৬ (২১.৯)	৭৫৮ (১০০)
উপ-অবয়ব-৪	৮ (১.৭)	৮৯ (১৮.৮)	৩০৩ (৬৩.৯)	৭৪ (১৫.৬)	৪৭৪ (১০০)	১ (০.২)	৭১ (১৫)	৩০৮ (৬৫.১)	৯৩ (১৯.৭)	৪৭৩ (১০০)
উপ-অবয়ব-৫	১০ (১.৮)	৮৩ (১৪.৯)	৩৮৭ (৬৯.৫)	৭৭ (১৩.৮)	৫৫৭ (১০০)	১০ (১.৮)	৫৮ (১০.৫)	৩৬৯ (৬৬.৬)	১১৭ (২১.১)	৫৫৪ (১০০)
উপ-অবয়ব-৬	২১ (৪.৫)	১০৯ (২৩.৩)	২৭৪ (৫৮.৫)	৬৪ (১৩.৭)	৪৬৮ (১০০)	১০ (২.২)	৯৮ (২১.১)	২৭২ (৫৮.৬)	৮৪ (১৮.১)	৪৬৪ (১০০)
মোট	৫৩ (১.৬)	৪৮৩ (১৪.৪)	২৩.১২ (৬৯)	৪৯৯ (১৫)	৩৩৪৭ (১০০)	৩৬ (১.১)	৩৭০ (১১.৪)	২২২৮ (৬৮.৫)	৬১৮ (১৯)	৩২৫২ (১০০)

পরিশিষ্ট

(খ) লোক প্রশাসন

উব অবয়ব-১ঃ	**প্রশাসনে নৈতিকতা**
লোপ্র-১	প্রশাসনে নৈতিকতা
লোপ্র-২	প্রশাসনে শিষ্টাচার
লোপ্র-৩	সামাজিক মূল্যবোধ ও প্রশাসন
লোপ্র-৪	ধর্ম ও নৈতিকতার উৎস
লোপ্র-৫	সুশীল সেবকের গুণাবলী-১
লোপ্র-৬	সুশীল সেবকের গুণাবলী-২
লোপ্র-৭	সুশীল সেবকের ভূমিকা-১
লোপ্র-৮	সুশীল সেবকের ভূমিকা-২
লোপ্র-৯	সুশীল সেবকের ভূমিকা-৩
লোপ্র-১০	আত্ম-বিশ্লেষণ পদ্ধতি
লোপ্র-১১	দুর্নীতি ঃ কারণ ও প্রতিকার
লোপ্র-১২	রাজনীতি ও আমলাতন্ত্রঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত
উপ অবয়ব২ঃ	**সরকারী পদ্ধতি**
লোপ্র-১৩	তুলনামূলক সরকার ও বাংলাদেশের সাংবিধানিক বিবর্তন
লোপ্র-১৪	রাষ্ট্রের মূলনীতি ও মৌলিক অধিকার সমূহ
লোপ্র-১৫	সংবিধানে রাষ্ট্রের নির্বাহী ক্ষমতা বিন্যাস
লোপ্র-১৬	জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী ও প্রশাসকের দায়িত্ব
লোপ্র-১৭	কার্য বিধিমালা
লোপ্র-১৮	কার্যবিধিমালা অনুশীলনী
লোপ্র-১৯	বাংলাদেশ সরকারের কাঠামো
লোপ্র-২০	বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা
লোপ্র-২১	ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলায় সরকারী কর্মকর্তাদের অধিকার ও দায়িত্ব।
উপ-অয়ব ৩ঃ	**কর্মী ব্যবস্থাপনা**
লোপ্র-২২	নিয়োগ পদ্ধতি
লোপ্র-২৩	পদোন্নতি পদ্ধতি ঃ সমস্যা

	ও সম্ভাবনা
লোপ্র-২৪	কর্ম বিবরণী ও কর্ম স্পেসিফিকেশন
লোপ্র-২৫	চাকরীর সাধারণ শর্তাবলী
লোপ্র-২৬	আচরণ বিধি
লোপ্র-২৭	শৃংখলা ও আপিল বিধি-১
লোপ্র-২৮	শৃংখলা ও আপিল বিধি-২
লোপ্র-৯	শৃঙ্খলা ও অপিল বিধ-৩
লোপ্র-৩০	শৃংখলা ও আপিল বিধি (অনূশীলনী)-৪
লোপ্র-৩১	বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন প্রণয়ন
লোপ্র-৩২	বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন (প্রায়োগিক)
লোপ্র-৩৩	সার্ভিস বুক লিখন ও সংরক্ষণ পদ্ধতি
লোপ্র-৩৪	বদলীর নীতিমালা
লোপ্র-৩৫	প্রশিক্ষণ নীতিমালা
লোপ্র-৩৬	ছুটিবিধি
উপ অবয়ব ৪ঃ	**আর্থ ব্যবস্থাপনা**
লোপ্র-৩৮	বাংলাদেশ সরকারের বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন
লোপ্র-৩৯	নিজস্ব দপ্তর/সংস্থার বাজেট প্রণয়ন
লোপ্র-৪০	আয়ন-ব্যয়ন অফিসারের দায়িত্ব ও কর্তব্য
লোপ্র-৪১	আর্থ বিধি প্রয়োগ
লোপ্র-৪২	আর্থ বিধি প্রয়োগ অনুশীলনী
লোপ্র-৪৩	বেতন নির্ধারণ
লোপ্র-৪৪	ভ্রমণ ভাতা বিধি
লোপ্র-৪৫	অগ্রিম গ্রহণ, সমন্বয় ও বিল পরিশোধ প্রক্রিয়া
লোপ্র-৪৬	ক্রয় ও বিক্রয় নীতিমালা
লোপ্র-৪৭	বিদেশ ভ্রমণ বিধিমালা
লোপ্র-৪৮	আয়কর
উপ অবয়ব ৫ঃ	**অফিস ব্যবস্থাপনা**
লোপ্র-৪৯	নথি ব্যবস্থাপনা

লোপ্র-৫০	নোট লিখন
লোপ্র-৫১	নোট লিখন অনুশীলনী
লোপ্র-৫২	সারাংশ লিখন
লোপ্র-৫৩	কর্ম পরিবেশ ও অফিস সজ্জা
লোপ্র-৫৪	অফিস নিরাপত্তা পদ্ধতি ও প্রয়োগ
লোপ্র-৫৫	অফিসের রেকর্ডসমূহ ও এর ব্যবস্থাপনা
লোপ্র-৫৬	অফিস লাইব্রেরী ও ব্যবস্থাপনা
লোপ্র-৫৭	অফিস ভবন রক্ষণাবেক্ষণ
লোপ্র-৫৮	ভান্ডার ব্যবস্থাপনা
লোপ্র-৫৯	যানবাহন নীতিমালা
লোপ্র-৬০	প্রকাশনা বিধিঃ পদ্ধতি ও প্রয়োগ
লোপ্র-৬১	অফিস পোষাক ও লিভারীজ বিধিমালা
উপ অবয়ব ৬ঃ	**প্রশাসনিক যোগাযোগ**
লোপ্র-৬২	সরকারী চিঠি পত্র লিখন
লোপ্র-৬৩	সরকারী চিঠিপত্র লিখন অনুশীলনী
লোপ্র-৬৪	সভা সম্মেলন কৌশল
লোপ্র-৬৫	সভার কার্যপত্র লিখন
লোপ্র-৬৬	সভার কার্যবিবরণী লিখন
লোপ্র-৬৭	প্রতিবেদন রচনা
লোপ্র-৬৮	অফিস পরিদর্শন
লোপ্- লোপ্র-৬৯	সরকারী কর্মকর্তাদের গণসংযোগের সমস্যাবলী
লোপ্র-৭০	সরকারী কর্মকর্তাদের ও গণপ্রতিনিধিদের পারস্পরিক সম্পর্ক
লোপ্র-৭১	বাংলা ভাষা ব্যবহার ও সম্প্রসারণ

লেখকের প্রতি জ্ঞাতব্য

- ✡ লোক প্রশাসন সাময়িকীতে লোক প্রশাসন, উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন অর্থনীতি, পরিবেশ, সমসাময়িক আন্তর্জাতিক ও বাংলাদেশের ঘটনাবলী, প্রশিক্ষণ,প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণাধর্মী, বিশ্লেষণমূলক ও তথ্যসমৃদ্ধ মৌলিক প্রবন্ধ ও পুস্তক সমালোচনা প্রকাশিত হয়।
- ✡ রিপোর্ট সাইজের কাগজে এক পৃষ্ঠায় টাইপকৃত কিংবা স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লিখিত লেখা/প্রবন্ধ মূলকপিসহ মোট ৩ (তিন) কপি সম্পাদক, লোক প্রশাসন সাময়িকী, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা, এই ঠিকানায় প্রেরণ করতে হবে।
- ✡ লেখা/প্রবন্ধ ৬,০০০ শব্দ (মুদ্রিত ২০ পৃষ্ঠা) এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা বাঞ্ছনীয়।
- ✡ পূর্বে অন্য কোন পত্রিকায়/গ্রন্থে প্রকাশিত লেখা মনোনীত হবে না।
- ✡ লেখা মনোনয়নের এবং পরিমার্জন/অংশবিশেষ বাতিল করার পূর্ণ অধিকার সম্পাদনা পরিষদের রয়েছে। অমনোনীত লেখা ফেরত পাঠানো হয় না।
- ✡ মুদ্রিত প্রতি পৃষ্ঠার (৩০০শব্দ) জন্য লেখককে ২০০ (দুইশত) টাকা হারে সম্মানী প্রদান করা হয়।

বিপিএটিসির প্রকাশনা বিক্রয় সম্পর্কিত তথ্য
কেন্দ্রস্থ অনুষদ ভবন-২, এর ৩য় তলায় প্রকাশনা শাখার দপ্তরে তালিকাভুক্ত বই, পুস্তক, জার্নাল পাওয়া যায়।
কেন্দ্র থেকে সরাসরি ক্রয়ের ক্ষেত্রে বই, পুস্তক, জার্নালের বিক্রয় মূল্যের উপর সাধারণত ৫০% কমিশন দেয়া হয়ে থাকে।

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

প্রকাশিত পুস্তক/পত্রিকা ও মূল্য তালিকা

ক্রমিক নং	শিরোনাম ও লেখক	প্রতি কপির দাম	কমিশনসহ প্রতি কপির দাম
1.	বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা	৪০/০০	টাকা ঃ ২০/০০
2.	বাংলাদেশ পাবলিক এ্যাডমিনিস্ট্রেশন জার্নাল	৪০/০০	টাকা ঃ ২০/০০
3.	লোক প্রশাসন সাময়িকী	১৫/০০	টাকা ঃ ৭/৫০
4.	Post-entry Training in Bangladesh Civil Service: The Challenge & Response	40/00	Tk. 20/00
5.	Career Planning in Bangladesh	120/00	Tk. 60/00
6.	Coordination in Public Administration in Bangladesh	100/00	Tk. 50/00
7.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে মহিলা	১২০/০০	টাকা ঃ ৬০/০০
8.	Sustainability of Project For Higher Agricualtural Education	40/00	Tk. 20/00
9.	Approaches to Rural Health Care: A Case Study of Ganoshasthaya Kendra	40/00	Tk. 20/00
10.	Sustainability of Rural Development Projects: A Case Study of Rural Development Project In Bangladesh	40/00	Tk. 20/00
11.	Sustainability of Primary Education Project in Bangladesh	40/00	Tk. 20/00
12.	Handbook for the Magistrates	100/00	Tk. 50/00
13.	A Study of the use of Computer	50/00	Tk. 25/00
14.	সামাজিক গবেষণা পদ্ধতি	125/00	Tk. 62/50